গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২৫ - ৩১ মার্চ, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপিকে পরাস্ত করুন

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

(২২ মার্চ কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য)

ভারতের পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আমরা আসামে ২৫টি, কেরালায় ২৬টি এবং তামিলনাড়ুতে ২টি কেন্দ্রে লড়ছি। সব জায়গায় আমরা এককভাবেই লড়ছি।

পশ্চিমবাংলায় ১৮ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস যেদিন তাদের প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল, স্বাভাবিকভাবেই অনেকের প্রত্যাশা ছিল, আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কী, সেটা জানার। কিন্তু আমরা তখন কিছু বলিনি। না বলার কারণ, আমাদের পার্টি যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের সমস্ত স্তরের কর্মী-সমর্থক এবং ব্যাপক জনগণের মতামত সংগ্রহ করে ও তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিই। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমরা ঐক্য করেছিলাম, এমনকী গত লোকসভা নির্বাচনে যখন তারা একসাথে লড়ার জন্য কংগ্রেসকে ডেকে আনল এবং সেই কারণে তাদের সাথে আমাদের ঐক্য ভাঙার অবস্থা হয়েছিল, তখনও এই প্রক্রিয়ায় আমরা মতামত সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই জন্যেই এবারও আমরা কয়েকদিন এভাবে মতামত নিয়ে দলের সমস্ত স্তরে আলোচনার পর আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তই এখানে উপস্থিত করছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আমরা প্রথম দিকে জয়নগর এবং কুলতলি বাদে ১৫টি কেন্দ্রের তালিকা দিয়েছিলাম। আমরা জানতাম, আমরা এর আগে নির্বাচনে লড়েছি এমন কিছু কেন্দ্রে এবার তাঁরা লড়বেন, সেই জন্য সে সব কেন্দ্র আমরা চাইনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমাদের ১ মার্চ, ৫ মার্চ, সর্বশেষ ১৬ মার্চ বৈঠক হয়। তিনটি বৈঠকই আমাদের অফিসে হয়েছিল। শেষ বৈঠকে, অর্থাৎ ১৬ মার্চ আমরা বলি, আমাদের যে দু'টি আসন আছে, তা তো আছেই, এর সাথে ১৫টির পরিবর্তে অন্তত ১২টি কেন্দ্র আমাদের দেওয়া হোক। তাঁরা বলেছিলেন, এর পর আমাদের সাথে তাঁরা বসবেন এবং মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, এর মধ্যে তাঁরা আমাদের সাথে কোনও যোগাযোগ করেননি, বৈঠক তো দূরের কথা। অথচ তৃণমূল নেতারা পশ্চিমবাংলায় আসন ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য কংগ্রেসের সাথে এত সময় ধরে দর কষাকষি করলেন, ঘন ঘন দিল্লি-কলকাতা যাতায়াত করলেন, কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলার সময় পেলেন না। হঠাৎ একতরফা তাঁরা একটা তালিকা ঘোষণা করলেন। সেখানে আমাদের দলের ইতিপূর্বে বহুবার নির্বাচিত দু'টি কেন্দ্রের নাম মাত্র আছে। স্বাভাবিকভাবেই, শুধু আমাদের দলের কর্মী-সমর্থকরাই নয়, পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ, বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁরা ভাবতেই পারছেন না এ রকম হতে পারে। অনেকেই মুখে বলেছেন, এস এম এস-ও পাঠিয়ে বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, এটা আমরা আশা করিনি'। কেউ কেউ বলেছেন, 'কেন আপনারা ১৫টা আসন

পাঁচের পাতায় দেখুন

(বাম দিক থেকে) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর

লিবিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটোর সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

লিবিয়ার নির্দোষ জনগণের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী গদ্দাফি শাসনযন্ত্রের হিংসা বন্ধ করার অজুহাত তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী লিবিয়ায় যে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছি। দক্ষিণপন্থী চরম স্বৈরাচারী গদ্দাফি শাসনের বিরুদ্ধে লিবিয়ার জনগণের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর সাথে সাথে আমাদের দৃঢ় অভিমত হল, লিবিয়ায় কী ধরনের শাসনব্যবস্থা হবে, তা স্থির করার দায়িত্ব ও অধিকার কেবলমাত্র লিবিয়ার জনগণেরই আছে। সেখানে রাষ্ট্রসংঘকে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করে, আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের কোনও অধিকারই নেই লিবিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো ও সামরিক অভিযান চালাবার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ন্যাটো মিত্রদের এই আগ্রাসী ভূমিকার পিছনে লিবিয়ার জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও আকাঙ্ক্ষাই নেই, তাদের একমাত্র লক্ষ্য, লিবিয়ার উচ্চমানের তেলভাণ্ডার দখল করা, সেখানে একটি পুতুল সরকার বসিয়ে ঐ অঞ্চলে জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে দমন করা।

বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তার চাপে সাম্রাজ্যবাদীদের লিবিয়া থেকে হাত ওঠাতে বাধ্য করা যায়।

২০ মার্চ লিবিয়ায় ন্যাটো আগ্রাসনের দিনই কলকাতার রাস্তায় এস ইউ সি আই(সি)-র বিক্ষোভ

জাপান ঃ পরমাণু বিপর্যয়ের ভয়াবহতা প্রকট হল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

জাপানের সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও সুনামির মতো বেদনাদায়ক ঘটনায় অসংখ্য অসহায় মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে, ঘর-বাড়ি, জনপদের ব্যাপক ধ্বংস ঘটেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পরমাণু প্রকল্পগুলির বিপর্যয়, যার ভয়াবহ ফলাফল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতিকে ছাপিয়ে সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এই ঘটনা পরমাণু শক্তি উৎপাদনের সাথে যুক্ত বিপদের ভয়াবহতাকেই আরও একবার প্রকট করে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারত সরকার যখন দেশে ব্যাপক হারে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করে, তখন আমাদের দল তার বিরুদ্ধতা করে পরমাণু চুল্লির নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর গভীর উদ্বেগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রযুক্তিগত ক্ষমতার মানদণ্ডে যে জাপান ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যার প্রস্তুতিও দৃষ্টান্তমূলক, সেই জাপানও পরমাণু চুল্লির 'মেল্টডাউন'-এর ফলে ভয়ানক পরমাণু বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। জাপানের তুলনায় অনেক কম মাত্রায়ও এ ধরনের বিপর্যয় যদি ভারতে কখনও ঘটে যায়, তবে তার ভয়াবহ পরিণাম কী হতে পারে, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এ ব্যাপারে ভারত সরকার ও তার বেতনভুক প্রযুক্তিবিদদের মিথ্যাচার আজ পুরোপুরি উদঘাটিত হয়ে গেছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, জনগণের কল্যাণ নিয়ে পুঁজিবাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাদের সমস্ত কিছুই মুনাফালালসার অধীন। ফলে শোষণমূলক মুনাফালোভী পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করার জন্য সংগঠিত হওয়া ও লড়াই ছাড়া ভারতীয় জনগণের সামনে অন্য বিকল্প নেই।

সিপিএম শাসনে চরম বিপন্ন নারীর নিরাপত্তা

সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দল করেন না এমন কোনও মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ভোট দেবেন কাকে — তা হলে যে উত্তরটা সাধারণত আসে, তা হল, যারা সুশাসন দেবে, ভাল কাজ করবে তাদেরই ভোট দেব। এই সুশাসন বলতে কী বোঝায়? সুশাসন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ মানুষ দু'বেলা খেয়েপরে বাঁচতে পারবে, নির্বিঘ্নে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে, রাস্তায় বেরোলে নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে না, লাশ হতে হবে না কারও সন্তানকে, সরকারি দপ্তরে কোনও কাজের জন্য ঘুষ দিতে হবে না, বারবার হয়রানির শিকার হতে হবে না, এমন একটি ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ৩৫ বছরের শাসনে তা কি আদৌ আছে?

এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার সাংঘাতিক অধঃপতন ঘটেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বারাসতের ভি আই পি পাড়াতে তিন মদ্যপের হাত থেকে দিদির সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাজীব দাস। কিশোর রাজীবের মর্মান্তিক মৃত্যু গোটা বাংলার বিবেককে আলোড়িত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কী ধরনের শাসনধারা, যেখানে আর্ত দিদির 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুনেও ঢিলছোঁড়া দূরত্বে থাকা পুলিশ সুপারের বাংলো পাহারায় নিযুক্ত কনস্টেবল কোনও সাড়া দেয় না? থানাকে জানালেও পুলিশ তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসে না? এ কেমন শাসন ধারা যেখানে জেলাশাসকের বাংলোর গেট ধরে অসহায় নারীর প্রাণ বাঁচানোর কাতর আর্তনাদেও গেট খোলা হয় না? কেন এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা?

রাজ্যের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দায়িত্বহীনতা যে প্রবলভাবে সংক্রমিত হয়েছে, মানবিকতার যে ভয়াবহ পচন ঘটেছে, তা আজ একেবারেই নগ্ন। গোটা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা তিলে তিলে হত্যা করে এমনভাবে সিপিএমের অনুগত দাসে পরিণত করা হয়েছে যে, প্রশাসনের কর্তারা জনসাধারণকে 'সার্ভিস' দেওয়া আর দায়িত্ব বলে মনে করে না।

এই রাজ্যে নারীর নিরাপত্তা সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। ২০০৯ সালে সারা ভারতে ৮১,৩৪৪ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেছে ১৮ শতাংশ। ন্যাশনাল আইন রেকর্ড ব্যুরো-২০০৮-এর তথ্যানুসারে পশ্চিমবঙ্গ ধর্ষণে দ্বিতীয়। প্রথম মধ্যপ্রদেশ, তৃতীয় উত্তরপ্রদেশ। নারী পাচারেও এ রাজ্য এগিয়ে। প্রতি বছর ৫ হাজারেরও বেশি মেয়ে এ রাজ্য থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালের প্রথম ১১ মাসে শুধু মালদা জেলা থেকে ১২৪৭ জন অল্পবয়সী মেয়ে পাচার হয়েছে। এ তথ্য মালদা জেলা পুলিশের। একটা জেলা থেকে মাসে গড়ে ১১৩ জন মেয়ে পাচারের ঘটনা ঘটছে, তবুও প্রশাসনের টনক নড়ে না।

১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় রাধামোহনপুরে রাত ৯টা নাগাদ টিউশন থেকে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। একদল দুষ্কৃতী তার শ্লীলতাহানি করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদহের রতুয়ায় চাঁদমনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সালাবাদপুর গ্রামে এক ছাত্রী ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় একদল দুষ্কৃতী তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বাড়ি থেকে এক কিমি দূরে সেচ পাম্প মেশিনের ঘরে তার অচৈতন্য দেহ পাওয়া যায়। ধর্ষিতার বাবা রতুয়া থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। কারণ, চার ধর্ষকের একজন সিপিএমের প্রাক্তন প্রধানের ছেলে (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬-০২-২০১১)। এই একটি ঘটনাই দেখিয়ে দেয়, পুলিশ কেন নারীধর্ষণ, নারী পাচার — এসব অপরাধ সংক্রান্ত ডায়েরি নেয় না, এসব বন্ধ করতে সক্রিয় হয় না। ১৬ ফেব্রুয়ারি সিউড়িতে এক মদের দোকানের সামনে ইভটিজিং-এর কবলে পড়েন দুই তরুণী। শুধু জেলা শহরই নয়, কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় রাত বাড়ার সাথে সাথে মহিলাদের, বিশেষ করে তরুণীদের একলা হাঁটা সহজ নয়। কলকাতা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় ২০০৪ সালে নথিভুক্ত শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ১৮২টি। ২০১০ সালে ঘটেছে ২২৭টি। অনথিভুক্ত শ্লীলতাহানির ঘটনা অসংখ্য।

আপনার স্নেহের কন্যাকে আপনি স্কুলে পাঠিয়েছেন, সে নিরাপদে ফিরতে পারবে কি না, নাকি পাচার চক্র, ইভটিজার চক্রের কবলে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হবে, এ আশঙ্কা সর্বদা আপনাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না কি?। দিবালোকে এসব ঘটছে। সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও ভয়াবহ। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গে একটা সময় ছিল যখন সিনেমা হলে 'নাইট শো' দেখেও মহিলারা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারতেন। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালেই সমাজবিরোধীরা তৎপর হয়ে ওঠে। গত ৩৫ বছর সিপিএমের রাজত্বে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এমন সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে যে, যেকোনও মুহূর্তে যে কেউ এদের হিংস্র থাবার কবলে পড়ে যেতে পারেন।

কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল? এর অন্যতম প্রধান কারণ, সিপিএম শাসনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শাস্তি পায় না, বরং প্রশ্রয় পায়। বহু ক্ষেত্রে অপরাধের সঙ্গে সিপিএমের লোকজন সরাসরি জড়িত থাকে। ফলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণই করে না। আন্দোলনের চাপে যদি বহু টালবাহানার পর অভিযোগ গ্রহণ এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়ও, তবুও তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া হয় না। অধিকাংশ দুষ্কৃতীই পুলিশের দেওয়া মামুলি ধারার ফাঁকফোঁকর দিয়ে গ্রেপ্তারের দিনই জামিন পেয়ে যাচ্ছে এবং বাইরে এসে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য অভিযোগকারীকেই হুমকি দিচ্ছে। এই যে একটা ত্রাসের পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে অভিভাবকদেরকে যে একটা প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ এর হাত থেকে মুক্তি চায়।

নারী ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধকেও সিপিএমের মন্ত্রীরা আদৌ গুরুত্ব দেন না। বানতলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী অনিতা দেওয়ানকে একদল দুষ্কৃতী ধর্ষণ করলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'এমন তো কতই হয়।' যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলতে পারেন, সে রাজ্য অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য তো হবেই। এমনতরো মন্ত্রীদের তো দুষ্কৃতীরা মাথায় তুলে নাচবেই। নারী ধর্ষিতা হলে এই দলের নেতারা অপরাধীদের দিকে আঙুল না তুলে অবলীলায় বলে দেন 'মহিলা দুশ্চরিত্র'। যেন চারিত্রিক দোষ থাকলেই ধর্ষণ করা চলে। কী সাংঘাতিক রুচি-সংস্কৃতি বিবর্জিত মনোবৃত্তি! অপরাধের পক্ষে এই যদি হয় একটা দলের শীর্ষ নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাহলে অপরাধীরা তো অক্সিজেন পাবেই, এমন অবস্থায় নারীর নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়ে পারে?

নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণ সিপিএম সরকারের ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার নীতি। পুঁজিপতিদের ব্যাপক ট্যাক্স ছাড় দিয়ে এই সরকার রাজস্ব আদায়ের নামে গোটা বাংলায় গ্রামে শহরে পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে ব্যাপক মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিয়েছে। নারী নির্যাতনের যত ঘটনা ঘটছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা মদ্যপ। তবুও সিপিএম মদের ঢালাও প্রসার ঘটিয়েই চলেছে। কারণ, লাইসেন্স দেওয়ার নামে বিপুল কাটমানি এদের পকেটে যাচ্ছে। মাসে মাসে মাসোহারা তো আছেই। নারী লাঞ্ছিতা হোক, ধর্ষিতা হোক তাতে সিপিএমের কী। টাকা তো আসবে।

পুঁজিবাদী ভোগবাদী সংস্কৃতি মূল্যবোধের ব্যাপক অবনমন ঘটাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার প্রচলন করে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের বাঁধন তছনছ করে দিচ্ছে। এর ফলে জন্ম হচ্ছে এক ধরনের যৌন বিকার। সরকার সেনসরশিপ শিথিল করে দেওয়ায় অশ্লীল পত্রপত্রিকায়, অশ্লীল বিজ্ঞাপনে দেশ ছেয়ে গেছে, ব্লু-ফিল্মের ব্যাপক প্রচলন ঘটছে। এ সবের পরিণতিতে কিশোর ছাত্রদের-যুবকদের নৈতিক অবক্ষয় সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। আর তার সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছেন নারীরা।

নারীদের প্রতি সমাজ মননে শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও এই নির্যাতনের অন্যতম কারণ। এর পেছনে কাজ করছে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী মানসিকতা। বামপন্থীরা এই মানসিকতা ভাঙার শক্তি। কিন্তু সিপিএম নারীদের কী সম্মান দেয় নন্দীগ্রামের মহিলারা চোখের জলে তা উপলব্ধি করেছেন। তারা দলীয় ক্রিমিনালদের পুলিশের পোশাক পরিয়ে গণআন্দোলনকারী মহিলাদের গণধর্ষণ করিয়েছে। সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরেছে। এই নারকীয়তা দেখে গোটা রাজ্যের মানুষ ধিক্কারে ফেটে পড়েছে।

নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত এ হেন দুষ্টশক্তি সিপিএম যত বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকবে তত বেশি করে নারীজীবনে নেমে আসবে অত্যাচারের মাত্রা। কারণ, অপরাধজগতের লোকেদের ছাড়া সিপিএম আজ আর চলতে পারছে না। এরাই সিপিএমের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার অন্যতম কাণ্ডারী। সিপিএম ক্ষমতায় থাকলে থানা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে না, অপরাধীরা ধরা পড়বে না, ধরা পড়লেও অতি সহজেই জামিন পেয়ে যাবে, শাস্তি হবে না। ক্রিমিনালদের ঔদ্ধত্যই বাড়বে। আরও বিপন্ন হবে নারীর নিরাপত্তা। নারী সমাজকে নিরাপদে চলতে হলে মাদকমুক্ত সমাজ চাই। অথচ সিপিএম মাদকাসক্তির প্রসার মারাত্মকভাবে ঘটাচ্ছে। ফলে চূড়ান্ত জনবিরোধী এই সরকারকে পাল্টানো আজ অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে।

*** ধর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়**
*** প্রতি বছর ৫ সহস্রাধিক নারী পাচার হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে।**
*** সারা ভারতে যত নারী নির্যাতন হয় তার ১৮ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে**

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে বিপন্ন করছে সরকার

খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিকে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে খুচরো ব্যবসায়ীরা যে বিপন্ন হবে তা সহজেই অনুমেয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম শহর মিলিয়ে খুচরো দোকানের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৬৬টি। এই হিসাব কয়েক বছর আগের। এখন দোকানের সংখ্যা কম করেও ১২ লক্ষ। একটা দোকানের উপর ৪ জন মানুষ নির্ভরশীল ধরলে ৪৮ লক্ষ মানুষ এর ফলে বিপন্ন হবে।

আমেরিকার দৈত্যাকার পুঁজি ওয়াল মার্ট, জার্মানীর মেট্রো, ইংল্যান্ডের টেসকো প্রভৃতি বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠী এবং দেশিয় একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী ভারতের খুচরো বাজারে ঢুকতে চাইছে। কেন চাইছে? কারণ এদের বিপুল পুঁজি তীব্র বাজার সংকটের কারণে অলস হয়ে পড়ে আছে। বিনিয়োগের জায়গা নেই। ফলে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি দলের সরকারগুলি খুচরো ব্যবসায় এদের বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা বলছে, বিদেশি পুঁজি এলে চাকরি হবে। কতজনের চাকরি হবে? আর কতজন কাজ হারাবে? অভিজ্ঞ মহল বলছে, শপিং মলে একজন কাজ পেলে শপিং মলের জন্য বন্ধ হওয়া দোকানগুলির কমপক্ষে ৪০ জন কাজ হারাবে। এর নাম কর্মসংস্থান?

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ নিয়ে সিপিএমের বক্তব্য কী? তাদের বক্তব্য অনেকটা ভাবের ঘরে চুরি করার মতো। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে কী কী ক্ষতি হবে তা স্পষ্ট করে বলেও সিপিএম নিয়ন্ত্রিত আকারে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ চাইছে। সিপিএমের পলিটব্যুরো এক প্রস্তাবে বলেছে, 'সংগঠিত খুচরো ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।' তারা বলেছে, 'সংগঠিত খুচরো ব্যবসাকে এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া যাবে না, যার ফলে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ঘটবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে জীবিকাচ্যুতি ও কর্মহীনতা নেমে আসবে'। অর্থাৎ, তাদের বক্তব্য, খুচরো ব্যবসায় সংগঠিত বৃহৎ পুঁজি আসুক, তবে তা যেন অসংগঠিত স্বল্পপুঁজির খুচরো ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ না করে। কিন্তু পুঁজি এইসব ইচ্ছার কোনও মূল্য দেয় না। সে চলে আপন নিয়মে। বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে খায়, এটাই পুঁজির ধর্ম। এজন্য পুঁজিবাদে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হয়।

গড়িয়াহাটে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর খুচরো বিপণন কেন্দ্র স্পেনসার্স হাইপার মার্কেট উদ্বোধনের সময় হকাররা তীব্র প্রতিবাদ জানালে রাজ্যের তৎকালীন পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী হুমকির সুরে বলেছিলেন, 'গড়িয়াহাটে ওই শপিং মল হবেই...। কোনও হরিদাস পাল হকার নেতা তা আটকাতে পারবে না' (আনন্দবাজার ৬-৭-০৮)। এ বিষয়ে সিটু নেতা শ্যামল চক্রবর্তীর বক্তব্য কী? শ্যামলবাবু 'খুচরো বিপণনে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি বিনিয়োগের বিপদ' নামে একটি পুস্তিকা লিখলেও নিয়ন্ত্রিত আকারে শপিং মলের পক্ষে তিনিও। শ্যামলবাবুর ভাষায়, 'যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার নেই, সেখানে শপিং মল নিঃসন্দেহে কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে।' কিন্তু কোথায় নেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার? যেখানে মানুষের বসতি সেখানেই ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছে। তাহলে এসব বলার অর্থ কী? আসলে নানা ধানাই-পানাই করে সিপিএম নেতারা কৌশলে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের ছাড়পত্রই দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বন্ধুরা কি তা মেনে নেবেন? মেনে নেবেন কি হকারবন্ধুরা?

আসাম বিধানসভায় গণআন্দোলনের কণ্ঠকে শক্তিশালী করুন

আসাম রাজ্য কমিটির আহ্বান

আগামী ৪ ও ১১ এপ্রিল আসামে ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই কংগ্রেস, বিজেপি, অসম গণপরিষদ (এজিপি) প্রভৃতি বুর্জোয়া দলগুলি সরকার গড়ার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব দলগুলি ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করতেও শুরু করে দিয়েছে। ধর্ম, ভাষা বা বিভিন্ন সম্প্রদায়গত মনোভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ছড়ানোর খেলাও যথারীতি শুরু হয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে শিকেয় তুলে দিয়ে এইভাবে নির্বাচনের নামে যা চলছে তা এক প্রহসন। সরকারি ক্ষমতায় ভাগ পাওয়ার প্রতিযোগিতা এমন নোংরা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, প্রায়শই দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটি আসন পাওয়ার বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বহু নেতা রাতারাতি দল বা জোট বদল করতেও পিছপা হচ্ছে না। অর্থাৎ এইসব দলগুলি যে আদর্শের ধ্বজাই ধরে থাকুক না কেন, আসলে যে তা অন্তঃসারশূন্য তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। এসবই বাস্তবে বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু পচাগলা বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

দেশের স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়েই কংগ্রেস দল কেন্দ্রের সাথে সাথে এ রাজ্যেও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে। অন্যদিকে এজিপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেছে ১০ বছর। যার মধ্যে শেষ ৫ বছর সিপিআই(এম) বাইরে থেকে তাদের সমর্থন জুগিয়েছে এবং সিপিআই তাদের সরকারে সরাসরি যোগ দিয়েছে। জনতা দলও এ রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল প্রায় দেড় বছর। বিজেপি যদিও আসামে এ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসতে পারেনি, কিন্তু কেন্দ্রে তারাও বেশ কিছু বছর ক্ষমতা ভোগ করেছে। তাদের এই ক্ষমতায় থাকার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের বাস্তবে কোনও উপকারই হয়নি। বরং সামান্য দিনাতিপাত করাটাও তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একমাত্র মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর ইচ্ছামতো লুটের নিশ্চিন্ত বন্দোবস্ত করে দেওয়া ছাড়া ক্ষমতায় থেকে এইসব দলগুলির আর বিশেষ কোনও অবদান দেখা যায়নি। এবারের বিধানসভা নির্বাচন এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যখন রাজ্য তথা সারা দেশই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। কালোবাজারি মুনাফাখোররা একদিকে মানুষকে অবাধে শোষণ করে চলেছে, অন্যদিকে তাদেরই টাকায় বিভিন্ন দলগুলির নির্বাচনী তহবিল ফুলে ফেঁপে উঠছে। এর পাশাপাশি যা এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, তা হল হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও তহবিল তছরুপের ঘটনা। ইতিমধ্যেই উত্তর কাছাড় স্বশাসিত পর্ষদের এক হাজার কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সরকার প্রবল চাপের মুখে পড়ে তদন্ত শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আসলে এ হিমশৈলের কেবল চূড়ামাত্র। সমস্ত স্বশাসিত পর্ষদগুলির ক্ষেত্রেই এ রকম হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে; রাস্তা তৈরি, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ টাকা কোনও কাজই না করে, বা নামমাত্র কাজ করে বেমালুম আত্মসাৎ করা এ রাজ্যে একরকম রীতি হয়েই দাঁড়িয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো রেশন কার্ডের অস্তিত্ব রয়েছে রাজ্যে বিপিএল কার্ড নিয়ে দুর্নীতিও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এমনিতেই আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ক'টি রাজ্যই যথেষ্ট অনুন্নত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে তেমন কোনও উন্নয়ন হয়নি। ফলে সংকটের ধাক্কা এখানে আরও ভয়াবহ। স্বাধীনতার ঠিক পর পর দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেটুকুও শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল, তার ছিঁটেফোঁটাও আসামে দেখা যায়নি। প্রথম দিকে কংগ্রেস শুধুমাত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক উষ্মাকে উসকে দিয়ে ও তাকে ব্যবহার করেই বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়। ফলে এই সময়ে উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার তেমন কোনও তাগিদই তারা অনুভব করেনি। অপরদিকে সে সময়ের অবিভক্ত সিপিআই সঠিক বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে রাজ্যের এইসব প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিকেই সমর্থন জুগিয়ে আসে। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্যে সে সময় সামান্য যতটুকু শিল্প গড়ে উঠেছিল, তারও বেশিরভাগ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবে এখন কয়েকটি তৈল শোধনাগার ছাড়া সারা রাজ্যে তেমন কোনও ভারী শিল্প বলতে কিছুই নেই। শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে ন্যূনতম পরিকাঠামো দরকার রাজ্যে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা না তোলাই ভালো। রেললাইনের সম্প্রসারণ বা তার বৈদ্যুতিকরণ এ রাজ্যের মানুষের কাছে আজও এক অধরা স্বপ্ন। রাজ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে তেমন কোনও উদ্যোগ আজও চোখে পড়ে না। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে রাজ্যে বেকারির সমস্যা এক অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো কোনও কাজ না পেয়ে এইসব বেকার যুবকরা যেকোনওভাবে বেঁচে থাকতে নানাপ্রকার অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, অনেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক পরিবেশও ভয়াবহভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে গ্রামের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। কেন্দ্র ও রাজ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত বিশ্বায়নের নীতির ফলে কৃষিতে আরও ভয়াবহভাবে ভর্তুকি প্রত্যাহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি অর্থনীতিতেও বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিকে অবাধে ঢুকতে দেওয়ার ফলে বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি সবকিছুর দাম এখন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। কৃষকদের এখন চড়া দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে হয়, অথচ যখন ফসল ওঠে তখন তার উপযুক্ত দাম তারা পায় না। অন্যদিকে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ ও ক্ষুদ্র কৃষকদের এমন একটা অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যে তারা আপাদমস্তক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে বড় চাষি বা মহাজনদের কাছে তারা কম দামে জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে আসামে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা রীতিমতো উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গ্রামের মধ্যে কোনও রকম কাজ খুঁজে না পেয়ে এই বিপুল সংখ্যক উচ্ছিন্ন মানুষ স্বভাবতই শহরে ভিড় জমায় কোনও একটা কাজের খোঁজে। কিছু লোক কায়িক শ্রমে যুক্ত হতে পারলেও বাকিদের সামনে ভিখারিতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় খোলা থাকে না। রাজ্যে কৃষিযোগ্য জমির মোট পরিমাণ ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৪২ হেক্টর। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার হেক্টর, অর্থাৎ মোট জমির মাত্র ২.৬ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। ফলে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করা ছাড়া কৃষকদের আর কোনও উপায় থাকে না। তার উপর ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা ও ভাঙনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ি ঘর, জমিজমা, সবকিছু হারিয়ে তারা শেষপর্যন্ত ভিখারীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের যে দাবি আমাদের দলের পক্ষ থেকে বারবার তোলা হয়েছে কোনও সরকারই তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আসামে ধান একসময় উদ্বৃত্ত হত। আজ সেখানে চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। কৃষির অবস্থা এ রাজ্যে এতটাই পিছিয়ে।

পরিকল্পিত উপায়ে শিল্প ও কৃষির বিকাশের কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দিকে না গিয়ে আসাম সরকার কোষাগারের ঘাটতি মেটানোর সহজতম পন্থাটিই বরাবর অবলম্বন করে এসেছে। রাজ্যে সাধারণ মানুষের উপর বছর বছর নানা অজুহাতে বসেছে নতুন নতুন কর ও শুল্ক, অথবা তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বছর শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই জমির উপর কর গত বছরে যা ছিল তা তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা সংস্থা যেমন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা পরিবহন সংস্থা প্রভৃতিতে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি দেখিয়ে প্রতি বছরই বিদ্যুতের দাম ও বাসভাড়া বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অথচ ঐসব সংস্থাগুলির ক্ষতির আসল কারণ মাথাভারী প্রশাসন, প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা। এই বিপুল পরিমাণ অপচয় রোধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। আবার রাজ্য সরকার বর্তমানে এইসব সরকারি সংস্থাগুলিকে ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলিতেও নানাপ্রকার পরীক্ষা ও বেডের ভাড়া ক্রমাগত এমনভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যাতে ওগুলোও বাস্তবে বেসরকারি নার্সিংহোমের মতোই অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে রাজ্যের গরিব সাধারণ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে গ্রামে-শহরে- হাজার হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স বিলি করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এর ক্ষতিকর প্রভাব আজ সমাজের সর্বত্র পড়ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে রাজ্যের গরিব ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার দরজা চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে। সরকারি নিয়মে পাশ-ফেল প্রথা না থাকায় প্রায় কিছুই না শিখেও ছাত্ররা অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র একজন। তিনি একটি মাত্র ঘরে একসাথে প্রথম থেকে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের ক্লাস নেন। তাও আবার বহু স্কুলে সেই একটা ঘরও নেই। এর ফলে যেসব গরিব ও সাধারণ ছাত্রছাত্রী এইসব স্কুলে ভর্তি হয়, প্রায় কোনওরকম শিক্ষাই তারা পায় না। ফলে উচ্চতর শিক্ষার স্তরে পৌঁছানোর কোনও সুযোগই তাদের আর জোটে না। অপরদিকে ধনী, পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলে অনেক বেশি ফি দিয়েও পড়াশুনা করতে পারে। ফলে এরাই উচ্চশিক্ষার স্তরে পৌঁছাতে পারে। কলেজ স্তরে ফি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করার ফলে গরিবদের পক্ষে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভবই হয়ে পড়ে।

আসামে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বর্তমানে অত্যন্ত জটিল স্তরে রয়েছে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এ রাজ্যে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিধানসভার মোট ২৩টি আসন সে সময় বিভিন্ন বামপন্থী দলের হাতে ছিল। আমাদের দলও ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে ২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই ক্রমবিস্তারে ভয় পেয়ে এর গতিরোধ করার প্রয়োজনে এ রাজ্যের বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চক্রান্ত শুরু করে। তাদেরই মদতে ১৯৭৯ সালে জন্ম হয় 'আসাম আন্দোলনে'র। এই আন্দোলনের মূল স্লোগানই ছিল তথাকথিত বিদেশিদের রাজ্য থেকে বিতাড়ণ করতে হবে। মূলত আসু বা অল-আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের মূল ভিত্তিই ছিল জাতিবাদী (racial) বিদ্বেষ — যার ফলে এই সময়ে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষ, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অসহায়ভাবে প্রাণ হারান। গোটা আন্দোলনের প্রকৃতিই ছিল অনেকটা ফ্যাসিবাদী। আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সমস্ত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বলা হয় — নিজ নিজ দল ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ

তিনের পাতায় দেখুন

প্রার্থী তালিকা

	কেন্দ্র	জেলা	প্রার্থী
১।	গোয়ালপাড়া ইস্ট	গোয়ালপাড়া	কমরেড আজহার হুসেন
২।	গোয়ালপাড়া ওয়েস্ট	,,	কমরেড নাজমুল হক
৩।	জলেশ্বর	,,	কমরেড আবদুল হামিদ
৪।	মানকাচার	ধুবড়ি	কমরেড সুরতজামান মণ্ডল
৫।	সাউথ সালমারা	,,	কমরেড জয়নাল আবেদিন
৬।	ধুবড়ি	,,	কমরেড জামির কাজি
৭।	শিলচর	কাছাড়	কমরেড তুষার পুরকায়স্থ
৮।	ধলাই (এস সি)	,,	কমরেড প্রণয় বর্ধন
৯।	সোনাই	,,	কমরেড মহরম আলি
১০।	করিমগঞ্জ উত্তর	করিমগঞ্জ	কমরেড পিকলু দে
১১।	পাথরকান্দি	,,	কমরেড দেবাংশু নাথ
১২।	রতাবাড়ি (এস সি)	,,	কমরেড মনিলাল রবিদাস
১৩।	হাইলাকান্দি	,,	কমরেড সুশীল পাল
১৪।	কলাইগাঁও	দরং	কমরেড জিতেন চালিহা
১৫।	সিপাঝাড়	,,	কমরেড পাহেশ্বরী বড়ুয়া
১৬।	পানেরি	উদলগুড়ি	কমরেড স্বর্ণলতা চালিহা
১৭।	বারামপুর	নগাঁও	কমরেড সোনারাম বরা
১৮।	নাহারকাটিয়া	ডিব্রুগড়	কমরেড মহেন্দ্র গগই
১৯।	লখিমপুর	লখিমপুর	কমরেড বিরিঞ্চি পেগু
২০।	ঢাকুয়াখানা	,,	কমরেড যূথিকা দোলেই
২১।	নওবৈচা	,,	কমরেড সুশীল বারি
২২।	নলবাড়ি	নলবাড়ি	কমরেড সাবিত্রী ডেকা
২৩।	কামালপুর	কামরূপ	কমরেড শিশির কাকতি
২৪।	সারুক্ষেত্রি	বরপেটা	কমরেড সইদুর রহমান খান
২৫।	ধেমাজি	ধেমাজি	কমরেড হেমকান্ত মিরি

সিপিএম-ই বর্গাদার উচ্ছেদ আইন তৈরি করেছে

রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে দমনপীড়নের পথে কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সিপিএমের গ্রামীণ ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। কৃষকের কাছে সিপিএম হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি লুণ্ঠনকারী। শিল্পের নামে এইসব জমি অধিগ্রহণ করা হলেও বহু ক্ষেত্রে সিপিএম সেই জমি বেশি দামে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গ্রামীণ মানুষের কাছে সিপিএমের পরিচিতি জমির দালাল রূপেও। তাদের এই পরিচিতি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামীণ ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক। এটা বুঝতে পেরেই সিপিএম বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করছে তারা কত কৃষক-দরদী। প্রচার করছে তারাই কৃষকদের জমি দিয়েছে। সিপিএমই জমিদাতা। তাদের বক্তব্য সিপিএম শাসনেই কৃষকের জমির অধিকার সুরক্ষিত।

১৩ মার্চ গণশক্তিতে সিপিএম লিখেছে, দেশের মোট কর্ষিত জমির ৩.৯ শতাংশ আছে পশ্চিমবঙ্গে। অথচ ভূমি সংস্কারের ফলে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ৫৪.৫ শতাংশ। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেই ভূমি সংস্কার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ কথা ঠিক। জোতদারদের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষার দল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি শ্রেণীস্বার্থেই ভূমি সংস্কারে গুরুত্ব দিতে পারে না, দেয়নি। ফলে অন্যান্য রাজ্যে ভূমি সংস্কার হয়েছে একেবারে নামমাত্র বা হয়ইনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যতটুকু ভূমি সংস্কার হয়েছে, সেই আন্দোলনের ইতিহাস যারা জানেন, তাঁরা অবশ্যই বলবেন, এই ভূমি সংস্কারের লড়াই মূলত হয়েছে ১৯৬৭, ১৯৬৯ সালে, তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। এবং জোতদারের কবল থেকে সিংহভাগ জমি উদ্ধার ও বণ্টন হয়েছে সেই সময়। তাহলে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের আমল থেকে ভূমি সংস্কারে ভাটা পড়ল কেন? খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, জোতদার চক্রের সঙ্গে সিপিএমের ঘনিষ্ঠতা ভূমি সংস্কার কর্মসূচিতে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। এই যুক্তফ্রন্টের অন্যতম লড়াকু শক্তি হিসাবে ছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ভূমি সংস্কারে যুক্তফ্রন্টের ক্রেডিটকে বামফ্রন্টের ক্রেডিট হিসাবে চালিয়ে দেওয়া চূড়ান্ত অনৈতিক। সেই অনৈতিক কাজটি সিপিএম করে যাচ্ছে এবং এর দ্বারা সিপিএম জমি অপহরণের দুর্নাম ঢাকতে চাইছে।

কিন্তু চাইলেই তো সব জিনিস হয় না। সিপিএম ৩৫ বছরের শাসনে কৃষক স্বার্থবিরোধী যেসব আইন করেছে, সেগুলির দ্বারাই তো কৃষকের জমি লুঠের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সিপিএম বর্গাদার আইন করার ঢাক পেটাচ্ছে। অথচ ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন করা হল, যাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, বর্গাদার রয়েছে এমন জমিতেও শিল্প স্থাপন করা যাবে। অর্থাৎ, বর্গাদার উচ্ছেদের আইন পাকাপোক্তভাবে তৈরি করা হল। তাহলে 'পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের জমির অধিকার সুরক্ষিত' এ কথা বলার যুক্তি কী? এটা তো নির্লজ্জ মিথ্যাচার!

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে সিপিএম কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার মেগাপ্রকল্প হাতে নিয়েছিল। ওরা সিঙ্গুরে টাটার স্বার্থে জমি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ১১০০ একর। নন্দীগ্রামে করেছিল ১৯০০০ একর, ডানকুনিতে উপনগরী করার জন্য ৫০১০ একর, মগরাহাট-বারুইপুর-বিষ্ণুপুর-কুলপিতে ৫১০০ একর, বানতলা চর্মনগরী ও বারাসাত-কুলপি সংযোগ সড়ক তৈরির জন্য ৮০০ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। ইতিপূর্বে রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পের জন্য নিয়েছে ২৬০০০ একর জমি। এই যে হাজার হাজার একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে, এবং অনিচ্ছুক কৃষকদের পুলিশ দিয়ে লাঠি-গুলি চালিয়েছে — তাতে সিপিএম যে আজ পুরোপুরি কৃষক স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলছে, এটা এ রাজ্যের কৃষকদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। ভোটে নিশ্চিতরূপে এর প্রভাব পড়বে এটা ভেবেই সিপিএম এখন বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।

দশ বছরে রাজ্যে জমিহারা ৫১৫৬৯৬ জন চাষি

নিজেদের খেতমজুর-দরদী হিসাবে দেখাতে সিপিএম প্রচার করে চলেছে যে, তারা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে জমির প্রচুর পাট্টা বিলি করে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষাধিক খেতমজুর বিনামূল্যে এই জমি পেয়েছেন। কিন্তু কোন জেলায় কোন ব্লকে কোন কোন কৃষককে তাঁরা এই জমি দিয়েছেন তা তাঁরাই জানেন।

১৯৯১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ মজুরের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৭৬ জন। ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে, গ্রামীণ মজুরের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৭২ জন। অর্থাৎ ১০ বছরে খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েছে ৫১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৯৬ জন। কোথা থেকে এই খেতমজুর তৈরি হল? সহজ হিসাব বলে, যাদের অল্পস্বল্প জমি ছিল, যারা প্রান্তিক চাষি, অল্প হলেও যারা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে একটু-আধটু জমি পেয়েছিলেন পুঁজিবাদী শোষণের কবলে পড়ে তাঁরা ঐ জমি ধরে রাখতে পারেননি, অভাবের কারণে তা বিক্রি করে দিতে হয়েছে। তাছাড়া সিপিএম শিল্পায়নের ধোঁকা দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ চাষের জমি কেড়ে নিয়েছে তাতেও বহু চাষি দিনমজুরে পরিণত হয়েছে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফলতা অর্থনৈতিক অঞ্চল, রাজারহাট উপনগরীর মতো বহু প্রকল্পের নামে জেলায় জেলায় কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, অধিগ্রহণ করে বহু জমি কাজেও লাগানো হয়নি। সিপিএমের তথাকথিত 'উন্নয়নের' মহাযজ্ঞে কৃষক জমি হারিয়ে ভূমিহীন হচ্ছে।

আসাম বিধানসভা নির্বাচন

তিনের পাতার পর

দিন, নতুবা তার ফল ভোগ করতে তৈরি থাকুন। বহু মানুষকে এই হুমকি দেওয়া হয় এবং বেশ কিছুজনকে খুনও করা হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অসমিয়াভাষী মানুষদের বোঝানো হয় যে অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং এটা তাদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। এই আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের একজোট থাকা দরকার, এই মৌলিক সচেতনতারই অভাব দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। আসাম আন্দোলনের সেই কালো দিনগুলোতেই, আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে ঐক্য বিনষ্টকারী এই সর্বনাশা চিন্তার স্বরূপ তুলে ধরতে মানুষের মধ্যে হাজার হাজার লিফলেট ও পুস্তিকা প্রচার করে। এর জন্য আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের সে সময় বহু ধরনের হুমকি ও আক্রমণের সামনেও পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও সে সময় আমাদের দল এই ধরনের উগ্র প্রাদেশিকতার প্রভাব রোধ করতে ৭টি দলের একটি জোট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

১৯৫১ সালের পর আগত সমস্ত অভিবাসীকে বিদেশি আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করতে হবে — আসাম আন্দোলনের পক্ষ থেকে ওঠা এই দাবির বিরুদ্ধে আমরা দাবি তুলি, জাতীয় প্রতিশ্রুতি ও আন্তর্জাতিক (ইন্দিরা-মুজিব) চুক্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ২৫ মার্চ, ১৯৭১কে বিদেশি চিহ্নিতকরণের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাছাড়া ঐ বিদেশি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াটিকেও সম্পূর্ণ আইনানুগ হতে হবে। সাত দলের জোটের পক্ষ থেকে ওঠা এই দাবি শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেয় এবং ১৯৮৫ সালে আসাম আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে কেন্দ্রের যে চুক্তি হয় তাতেও আমাদের তোলা এই দু'টি দাবি শেষপর্যন্ত মান্যতা পায় এবং সেই অনুযায়ীই আইএমডিটি আইন তৈরি করা হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৮৬ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে অসম গণপরিষদ বা এজিপি। আসাম আন্দোলনের গর্ভ থেকেই এই দলের উত্থান। ক্ষমতায় এসেও তারা তাদের উগ্র প্রাদেশিকতার লাইনই অনুসরণ করতে থাকে। তারা সরকারিভাবে একটি সার্কুলার জারি করে জানায় বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র আসামে বিদ্যালয় স্তরে অসমিয়া ভাষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এর বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকার মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ এই অঞ্চলের এমনকী জেলাস্তরের সরকারি ভাষাও হল বাংলা। আমাদেরই উদ্যোগে এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে উপত্যকায় সংগ্রাম কমিটি তৈরি হয় এবং এই সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে দু'জন শহীদের মৃত্যুও বরণ করেন। শেষপর্যন্ত সরকার ঐ নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বোড়ো ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দেয় তাকে কাজে লাগিয়ে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্য থেকেও নিজ নিজ স্বশাসিত পরিষদের দাবি উঠতে শুরু করে ও সেই দাবিতে আন্দোলনও শুরু হয়।

আমাদের দল, জনগণের প্রকৃত ক্ষোভ-বিক্ষোভকে যথার্থভাবে বিচারে নিয়েই জনগণকে দেখিয়েছে যে, একদা আসাম রাজ্যকে ভেঙে মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্য গঠনের দৃষ্টান্তই দেখিয়ে দেয় যে, আলাদা রাজ্য বা স্বশাসিত পরিষদ গঠন করার দ্বারা সাধারণ মানুষের কিছু সুবিধা হয় না, সমাজের উপরতলার কিছু গোষ্ঠী এর দ্বারা ক্ষমতায় যায় এবং তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়ে জনগণের উপর আরও শোষণ চালায়। ছোট ছোট রাজ্যে জনগণের বিভাজন মূল শত্রু পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বী ও নানা জনজাতি গোষ্ঠীগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথেও বাধা সৃষ্টি করে। একথাও সত্য যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা জাতিবাদী শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আমাদের এই বক্তব্যের যুক্তিধারা বোড়ো জনগণ পুরোপুরি গ্রহণ করলেও সিপিএম, সিপিআই ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি স্বশাসিত পরিষদ গঠনকে সমর্থন করে এবং পরে ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকারে এসে অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই হীন উদ্দেশ্যে, স্বশাসিত পরিষদের ব্যবস্থা করে দেয়। এর ফলে ক্রমাগত জনজাতি সংঘর্ষে আসাম বিদীর্ণ হয়, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত এ বছরের প্রথম দিনটি থেকেই রাভা ও গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা। তথাকথিত আসাম আন্দোলনের বিপর্যয়কর ফলাফল এখানেই শেষ হয়নি। এর গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় আলফা আন্দোলন যারা সার্বভৌম আসাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়। আমরা তাদের ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে দেখাই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারত একটি জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যার ক্ষমতায় আছে জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী এবং এদেরকে উচ্ছেদ করেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আলফা নেতৃত্বকে আমরা তাদের রাজনৈতিক লাইন পুনর্বিচার করতে আহ্বান জানাই। অধুনা আলফা নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসলেন, আমরা তাদের আবেদন করেছিলাম যাতে তারা সরকারের কাছে আসামের শিল্প ও অর্থিক উন্নয়নের একটা সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ দাবি করেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, আলফা নেতারাও 'আসু' লাইন অনুসরণ করে প্রধান ইস্যু হিসাবে সেই পুরানো বিদেশি বিতাড়নের ধুয়া তুলেছেন। এজন্যই কি 'আলফা' আন্দোলনে দু'হাজার যুবক, যাঁরা গণআন্দোলনের সংগ্রামী কর্মী হতে পারতেন, তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন?

জাতিবাদী শক্তিগুলি এখনও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও তাদের তোষামোদ করছে। আসুর দাবির কাছে নতিস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই আসামের এনআরসি-কে আধুনিক করার নামে পুরানো ৪নং বিধি বাতিল করে ৪এ নামে একটি নতুন বিধি প্রণয়ন করেছে অর্ডিন্যান্স জারি করে। এর ফলে কারও নাগরিকত্বের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সরকার থেকে নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া হবে না, প্রত্যেক নাগরিককে ১৯৫১ সালের নাগরিকত্ব রেজিস্টার অথবা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভোটে ভোটার স্লিপ দেখিয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব নিজেদেরই প্রমাণ করতে হবে। অথচ, ১৯৫১ সালের নাগরিক রেজিস্টার বা ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকা দুয়ের কোনটাই সরকারের কাছে নেই। যে দলিলের কোনও অস্তিত্বই নেই, তাকে ভিত্তি করে নাগরিকত্ব প্রমাণের পরিকল্পনা বাস্তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারতীয় নাগরিকদের নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সিপিএম, সিপিআই একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। এমনকী গত নির্বাচনের আগে, মুসলিম স্বার্থের ধ্বজাধারী বলে জন্ম নেওয়া দল এইউডিএফ পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলেনি, বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বলেছে, এনআরসি'র সংশোধন হয়ে গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। এসব কথা বলে আসলে এই দলটি কংগ্রেস ও এজিপি'র সাথে সমঝোতা করে সরকারি ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে চায়।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে জরুরি ছিল সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি ও আচরণবিধির ভিত্তিতে বিকল্প বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম দেওয়া। কিন্তু সিপিএম এবং সিপিআই বহুকাল আগেই বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক লাইন নিয়ে চলছে। তারা কখনই জাতিবাদী শক্তিগুলির চরিত্র উদ্‌ঘাটন করার জন্য আদর্শগত সংগ্রাম করেনি, বরং ১৯৯৬ সালে এজিপি'র মতো শক্তির সাথে জোট করেছে ও তারপর সরকারও করেছে। আবার ২০০১ সালে যখন এই 'প্রগতিশীল বন্ধু দলটি' নির্বাচনে বিজেপি'র সাথে জোট বাঁধে তখন ব্যথা পেয়ে সিপিএম ঐ বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এই হল সিপিএম, সিপিআই-এর চরম সুবিধাবাদী রাজনীতি।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আসামে একটির পর একটি গণআন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বামপন্থার পতাকা উর্ধ্বে তুলে রেখেছে। অতীতে আলফা আন্দোলনের সময় আমাদের দল রেল-কাম-রোড ব্রিজ তৈরির দাবিতে আন্দোলন করেছে, পরিবহন ভাড়া পুনর্বিন্যাসে বাধ্য করেছে সরকারকে। সম্প্রতি জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে জনগণের নানা দাবিতে আন্দোলন আমাদের দল গড়ে তুলেছে। আমাদের নিরবচ্ছিন্ন বামপন্থী সংগ্রামী ভূমিকা বহু মানুষকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করছে, জনমনে দলের সংগ্রামী ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতেই আসাম রাজ্য কমিটি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৫টি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে বিধানসভার অভ্যন্তরে গণআন্দোলনের কণ্ঠকে শক্তিশালী করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপিকে পরাস্ত করুন

একের পাতার পর

চাইলেন, কেন আরও বেশি চাইলেন না? অন্তত ১০-১৫টা আসন আপনারা জিতে আসবেন, এটা আমরা আশাই করেছিলাম'। কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে এমনও বলেছেন, 'তৃণমূল এর দ্বারা দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়েছে, অটোক্রেসির পরিচয় দিয়েছে'।

আর একটা কথাও সকলেই এক বাক্যে বলেছেন, ঐ দু'টি আসন আপনাদের দেওয়ার অর্থ কী? এ তো আপনাদের ছিলই। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হওয়ার বহু আগে থেকেই, এখনকার বহু দলের নেতাদের জন্ম হওয়ার আগে থেকেই জয়নগর-কুলতলি মানেই এস ইউ সি আই। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪টি নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে ১২ বার এই দু'টি আসনে আমরা জিতেছি। তার মধ্যে দশবার আমরা এককভাবে জিতেছি। ফলে এখানে আমাদের আসন দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জয়নগর কুলতলির গরিব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই কংগ্রেস আমল থেকে সিপিএম রাজত্ব পর্যন্ত অনেক রক্ত এবং প্রাণের বিনিময়ে এই দু'টি আসনেই আমাদের জিতিয়ে এসেছেন। ফলে দেওয়া না দেওয়ার নির্ধারক শক্তি সেখানকার জনগণ।

আমরা মনে করি, তৃণমূল যে সিদ্ধান্তটা নিল, সেটা ১৯৭৭ সালে ভোটের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছিলেন অনেকটা সে রকম। সে দিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন, বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এলে কোনও আন্দোলন, অশান্তি, অরাজকতা হবে না। কারণ এবার বামফ্রন্টে এস ইউ সি আই নেই। কাদের উদ্দেশে সেদিন এই ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটা আমরা জানি। যারা প্রতিবাদ-আন্দোলন-লড়াই চায় না, অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, ব্যুরোক্রেসি, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট— এদের আশ্বস্ত করার জন্যই এই ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের এই ঘোষণার সাথে, অর্থাৎ আমাদের দলকে জয়নগর ও কুলতলি বাদে অন্য আসন না দেওয়ার সাথে '৭৭ সালের সিপিএমের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর ঐ ঘোষণার মিল আছে। কেন না তৃণমূল এখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর দরজার সামনে পৌঁছে গেছে, সেই অবস্থায় আমাদের মতো একটা পার্টি, যে পার্টি লড়াই করে, আন্দোলন করে, প্রতিবাদ করে বলে সকলেই জানে, তার বিধানসভায় শক্তিবৃদ্ধি এ দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের কাছে, ব্যুরোক্রেসির কাছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্টের কাছে বিপজ্জনক। তৃণমূল কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে পশ্চিমবাংলার জনগণ দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। উল্লসিত হয়েছে কর্পোরেট সেক্টর, দেশি-বিদেশি মনোপলি হাউসগুলি, ব্যুরোক্রেসি, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট। এটা আমরা মনে করি। আমরা এ কথাও মনে করি, জনগণ যা-ই সমালোচনা করুক, ক্ষোভ প্রকাশ করুক, তৃণমূল কংগ্রেস তার রাজনীতিতে কনসিসটেন্ট এবং সেই অর্থেই এই সিদ্ধান্তটা তারা নিয়েছে যে, এস ইউ সি আই (সি)-র বিধানসভায় যেন শক্তি না বাড়ে। এটাও পরিষ্কার যে, আমাদের দলের উপর এই আঘাত মানে গণআন্দোলনের উপর আঘাত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত।

এ কথা মনে রাখা দরকার, বর্তমানে যে পরিবর্তনের হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে উঠছে, সেটা কোনও দলের সৃষ্টি নয়। এই পরিবর্তনের হাওয়া গণআন্দোলনেরই সৃষ্টি। আপনাদের মনে আছে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রথম কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। '৫২ সাল থেকে একের পর এক কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে করেছিল। সেদিনকার ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএম সংস্কারবাদী হলেও আন্দোলনে থাকত। এ ভাবে পরিবর্তনের জমি তৈরি হতে থাকে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত রূপ পায় '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে। তখনই পশ্চিমবাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়— আর কংগ্রেসকে নয়। এমনকী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দু'টি ফ্রন্ট হওয়া সত্ত্বেও সেবার নির্বাচনে কংগ্রেস মাইনরিটি হয়ে গিয়েছিল। ৬০-এর দশকের সেই পরিবর্তনের হাওয়া গণআন্দোলনের সৃষ্টি, যদিও বৃহৎ বাম দল সিপিএম সেই পরিবর্তনের হাওয়াটাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল। আর একটা পরিবর্তনের হাওয়া সারা ভারতে উঠেছিল ১৯৭৪ সালে। এর আগে দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ শাসন চলছিল। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন গোটা ভারতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই জে পি মুভমেন্টকে ভিত্তি করেই একটা বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে '৭৭ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়।

পশ্চিমবাংলায় '৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্য কোনও দল নয়, একমাত্র আমাদের দল সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করে। যাঁরা এখন একটু প্রবীণ তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন, আমাদের কর্মীরা মার খেয়ে রক্ত ঝরিয়েছিল কলকাতার রাস্তায়, বিভিন্ন শহর-গ্রামের রাস্তায়, অনেকে খুনও হয়েছিল, তবুও আমরা একটানা লড়াই করে গেছি। কংগ্রেসের সাথে তখন সিপিএমের বোঝাপড়া চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তখনও জন্ম হয়নি। পশ্চিমবাংলায় যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সিপিএম সরকার আন্দোলনের চাপে মানতে বাধ্য হয়েছিল, তার একটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির পুনঃপ্রবর্তন। এই আন্দোলনটা পরিচালনা করেছিল আমাদের পার্টি। ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক ও জনগণ সামিল হয়ে এই আন্দোলনকে সফল করেছিলেন। এটা পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের ইতিহাসে একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল। দ্বিতীয় দাবি মানতে সিপিএম বাধ্য হয়েছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে, যে আন্দোলনও আমরাই শুরু করি।

সিপিএমের রাজত্বে প্রথম বাংলা বনধ হয় আমাদের দলের ডাকে ১৯৯০ সালে। আজ পর্যন্ত আমাদের দল এককভাবে মোট ১৫ বার বাংলা বনধ জনগণের বিপুল সমর্থনে সফল করেছে। এ ছাড়াও শিক্ষা, বিদ্যুৎ, মূল্যবৃদ্ধি সহ বহু প্রশ্নে, শ্রমিক-কৃষকের দাবি নিয়ে, জনস্বাস্থ্য নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি এবং কিছু কিছু দাবি আদায়ও করেছি। এ ভাবে ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা লড়াই চালিয়ে আমাদের দল পরিবর্তনের জমি তৈরি করেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে এবং সাংবাদিক হিসাবে আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন আমরাই প্রথম শুরু করেছিলাম। এ আন্দোলনে যে আক্রমণ নেমে এসেছিল তাতে অবশ্য আমরা একা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে পারতাম না। তৃণমূল যুক্ত হওয়ার ফলেই আন্দোলনটা সফল হয়েছিল। এ কথা আমরা জনসমক্ষেও বারবার বলেছি। আমরাই প্রথম সিঙ্গুরের দাবি নিয়ে বাংলা বনধ করি। আমরাই প্রথম নন্দীগ্রামের দাবি নিয়ে বাংলা বনধ করি। আজ পর্যন্ত তৃণমূল এককভাবে আন্দোলন করে কোনও দাবি আদায় করেছে, এটা অন্তত আমার জানা নেই। তৃণমূল আন্দোলন হিসাবে অবস্থান করে, ধরনা করে, পদযাত্রা করে, আইন অমান্য করে। দীর্ঘদিন ধরে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস ও চরিত্র তাদের নেই। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে যে আন্দোলন সফল হয়েছে, সেটা একদিকে আমাদের পরিকল্পনা এবং কৌশলে সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফলে, অন্য দিকে তৃণমূলের জনবল, আর তৃণমূল থাকার ফলে প্রচার যন্ত্রের ব্যাকিং কাজ করার ফলে, মিডিয়ার প্রচারের জন্যই গোটা বাংলার মানুষ জানল, ভারতের মানুষ জানল কী অত্যাচার সেখানে চলছে। এর দ্বারা একটা প্রবল জনমত গড়ে উঠল এবং বুদ্ধিজীবীরা সামিল হলেন। এই সব নিয়েই আন্দোলনটা বিরাট রূপ নিল। শুধু আমরা করলে মিডিয়া এই প্রচার দিত না। আমাদের দল পরিচালিত কোনও আন্দোলনের খবরই ওরা বিশেষ দেয় না, এটা সকলেই জানে। ফলে আমাদের দুই দলের যুক্ত হওয়ায় এই আন্দোলন জয়ী হল। 'সিপিএম মাস্ট গো'— এই যে পরিবর্তনের দাবিটা উঠল, সেটা কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন থেকে। এই পরিবর্তনের হাওয়ায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভূমিকাটা অস্বীকার করা চলে না। অস্বীকার করা চলে না '৭৭ সাল থেকে একটানা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির আন্দোলনের ভূমিকা এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির ভূমিকা। এই হচ্ছে বাস্তব দিক। কারণ এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস কখনও একক ভাবে, কখনও বিজেপির সাথে, কখনও কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী জোট করেও সফল হয়নি। লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত করে তারা বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছে। ভোটের আগে স্লোগান তুলেছে, 'হয় এবার নয় নেভার'। কিন্তু এসব করেও সিপিএমকে হারাবার হাওয়া তৈরি করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন

গণআন্দোলনে আমাদের দলের ভূমিকার কারণেই জনগণের প্রত্যাশা ছিল, আগামী বিধানসভায় গণআন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর শক্তি বাড়ুক। এটাই ছিল মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন হিসাবে আমরা ১৫টি আসনের দাবি করেছিলাম। দুঃখের বিষয়, তাঁরা কথা দিয়েও ১৬ মার্চের পর আমাদের সাথে কোনও আলোচনা করলেন না, একবার জানানোরও প্রয়োজন বোধ করলেন না। একতরফা আসন ঘোষণা করে দিলেন। এটা গণতান্ত্রিক কি অগণতান্ত্রিক আচরণ, এটা শিষ্টাচার কি অশিষ্টাচার, তার বিচারের ভার আমি জনগণের উপর ছেড়ে দিলাম, তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উপর ছেড়ে দিলাম। যদিও আমি উল্লেখ করব, তৃণমূল কংগ্রেসের অসংখ্য নেতা-কর্মী আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁরাও বলেছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। বলেছেন, আপনাদের প্রতি অবিচার হয়েছে। আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেমন জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই। জোটটা হয়েছিল ২০০৮ সালের ১৩ মার্চ। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে সিপিএমের ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ হওয়ার পর গণআন্দোলনের স্বার্থে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরাই এই জোট গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককেও ডেকেছিলাম। ওরা নীতিগতভাবে একমত হয়েও সিপিএমকে ছাড়তে রাজি হয়নি। নকশালরাও রাজি হয়নি। তৃণমূল নেত্রী কষ্ট করে সেদিন আমাদের অফিসে এসেছিলেন। সেদিন তাঁদের আসার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তখন কংগ্রেসের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই, বিজেপির সাথেও সম্পর্ক নেই। আমাদের দলের এম এল এ-এম পি না থাকলেও পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের দলকে বিশেষ ভাবে দেখেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে একটা আস্থা, বিশ্বাস, মর্যাদা আছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএম সরকারের ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ দেখে গণআন্দোলনের স্বার্থে আমরা এই ঐক্য চেয়েছিলাম। এই ঐক্যের পিছনে তৃণমূলের লক্ষ্য ছিল, ভোটের স্বার্থে আমাদের ইমেজ কাজে লাগানো। আমাদের লক্ষ্য ছিল, গণআন্দোলনের স্বার্থে যতক্ষণ ও যতটুকু তাদের এই ঐক্যে পাওয়া যায়। আমরা বলেছিলাম, তিনটি শর্তে ঐক্য হবে। সেগুলি হচ্ছে কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্ব রাখতে হবে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে আক্রমণ করা চলবে না। তৃণমূল নেত্রী তিনটি শর্তেই রাজি হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত বক্তব্য আমাদের কাছে আছে যে, এগুলি তাঁরা মেনে চলবেন। পশ্চিমবাংলার জনগণ এই ঐক্যকে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছিল। তৃণমূল নেত্রীও সেদিন বলেছিলেন, এই ঐক্য পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক টার্নিং পয়েন্ট। এইসব কথা লিখিতভাবে আমাদের কাছে আছে।

এর পর একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাদের উভয় দলের কিছু কিছু যুক্ত আন্দোলন হয়েছিল, এ কথা ঠিক। কিন্তু ঐক্য প্রচণ্ড আঘাত পায় যখন পার্লামেন্ট ভোট আসে। পার্লামেন্ট ভোটে যখন তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলেন, আমরা শুধু রাজি হলাম না তাই নয়, এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করি। তাঁরা বললেন, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে আছে, তার সাহায্য ছাড়া জেতা যাবে না। আমরা বলি, জনগণের সমর্থনেই জেতা যায় এবং জেতা সম্ভব। যে কংগ্রেস সিপিএমের সাথে দীর্ঘদিন বোঝাপড়া করে চলেছে, দেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং ঘৃণ্য শক্তি, আগাগোড়া ওরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সিপিএম-কে সমর্থন করে গেছে, ফলে কংগ্রেসকে এ রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে। ফলে আমাদের সাথে তখন তৃণমূলের ঐক্য ভাঙে ভাঙে— এমন অবস্থা হয়েছিল। এরকম অবস্থায় জনগণ থেকে আমাদের কাছে অনুরোধ আসে, তৃণমূলও বারবার অনুরোধ করে যাতে ঐক্য না ভাঙে। তখন বাধ্য হয়ে একটা শর্তে আমরা ঐক্যে রাজি হই। সেটা হচ্ছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা ভোটে লড়ব এবং লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিলে আমরা কিন্তু বিরোধী পক্ষে থাকব। এর ভিত্তিতে তখন একটা বোঝাপড়া হয়।

তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু আমাদের সাথে ঐক্য ধীরে ধীরে চিড় খেতে থাকে। এর পর থেকে তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের কোনও যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি হয়নি। আন্দোলনের কোনও বিষয় নিয়ে, তাঁরা সরকারে যাওয়ার পর থেকে, আমরা বলা সত্ত্বেও কোনও বৈঠক হয়নি রাজ্য স্তরে। কোনও নেতার সঙ্গে অন্য দু-এক বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে এই পর্যন্ত। আমরা একাই একটানা আন্দোলন করে গেছি। লালগড় আন্দোলনে তাঁরা নামেননি, আমরা প্রথম থেকেই এই আন্দোলনে ছিলাম। এমনকী কংগ্রেস-সিপিএম বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যখন লালগড়ে যৌথবাহিনী নামল, তাঁরা মন্ত্রীসভায় থেকেও তার বিরোধিতা করেননি। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়েছি। লালগড় নিয়ে আমরা বাংলা বনধ করেছি। লালগড় নিয়ে আমরা আঞ্চলিক বনধও করেছি। তৃণমূল এসবে ছিল না। এরপর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, রাজ্যের বিরুদ্ধে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দাবিতে আমরা দু'বার বাংলা বনধ করেছি, তৃণমূল তার মধ্যে ছিল না। আমরা জনগণের ন্যায্য দাবিতে দেড় কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল করেছি, ওরা তার মধ্যে ছিল না। কোনও আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই তৃণমূল ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, চেম্বার্স অব কমার্স এবং ব্যুরোক্রেসির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ফলে তারা বলতে শুরু করল বনধ, ধর্মঘট, অবরোধ এগুলির মধ্যে তারা আর নেই। মানে যে আন্দোলনের ভিত্তিতে তাঁরা একদিন সামনে এসেছিলেন, সেই আন্দোলন তাঁরা আর করবেন না, এ কথা তাঁরা বলতে থাকেন। ফলে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়ার পর থেকে আন্দোলনের যে জোট, সেটা কার্যত ডিফাংক্ট বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। এই হচ্ছে বাস্তব। এগুলি আমরা এতদিন জনসমক্ষে বলিনি, যাতে সিপিএম বিরোধী আন্দোলন দুর্বল না হয়, মানুষের মধ্যে যাতে হতাশা না আসে। কিন্তু আজ বলবার সময় এসেছে বলে বলছি। এবার

সাতের পাতায় দেখুন

৩৫ বছরে শিক্ষায় দ্বিতীয় থেকে ১৯তম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করা হয়েছে বলে বামফ্রন্ট সরকার রাজকোষের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দেদার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। চোখ ধাঁধানো প্রচারে আগে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হলেও অবশ্য এখন তাদের প্রচারের ফানুস দুমড়ে-মুচড়ে একাকার। তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক(?) সরকারের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে তো! তাই তারা বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উঠেপড়ে লেগেছে মানুষকে বোঝাতে যে তারা কতটা শিক্ষা দরদী।

১৯৭৭ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় সিপিএম আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে শিক্ষায় ছিল দ্বিতীয় স্থানে। তাদের শাসনের কল্যাণে ৩০ বছরের মধ্যেই দেশের ৩৫ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৯ তম স্থানে নেমে এসেছে। সিপিএমের বিচারে অবশ্যই এটা অগ্রগতি। এসেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা নির্বাসনে পাঠিয়েছিল সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। তারা বলেছিল চাষাভুষার ইংরেজি পড়ার কী দরকার? ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদরা এগিয়ে এসেছিলেন এই সর্বনাশা শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করতে। ছাত্র-অভিভাবকরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে ১৯ বছর আন্দোলনের পর সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি শাসনকালে সিপিএম শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু বিপুল পরিমাণে ফি বাড়ায়নি, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। ফি বৃদ্ধি করতে গিয়ে তারা যুক্তি দিচ্ছে, সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে, শিক্ষার দাম বাড়বে না কেন? মেডিকেল শিক্ষায় লক্ষাধিক টাকা ক্যাপিটেশন ফি ধার্য করেছে। যদিও আন্দোলনের চাপে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। কেন্দ্রের শিক্ষার অধিকার আইন মেনে ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা তুলে দিয়েছে দীর্ঘকাল আগেই। শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে যে প্রাথমিক স্তরে তাকেই সবচেয়ে বেশি দুর্বল করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩৫ এর মধ্যে ৩৩। ডিপিইপি স্কীমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সার্বিক ধ্বংসের চক্রান্ত করা হয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী প্রাথমিকের ছাত্রদের বই বিনাপয়সায় দেওয়া বন্ধ হল শুধু নয়, ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব দেওয়া হল সেগুলি ছাপানোর জন্য। ফলে মোটা টাকার বিনিময়ে ছাত্ররা বই কিনতে বাধ্য হবে। এই হল সরকারের সুচতুর পরিকল্পনা। এর আরও ভয়ঙ্কর দিক হল, শিক্ষকদের বেতন সংগ্রহ হবে স্থানীয়ভাবে, অর্থাৎ স্থানীয় সাধারণ জনগণকেই শিক্ষার বোঝা বহন করতে হবে। শিক্ষার জন্য নতুন ট্যাক্স চাপিয়ে ও ফি বৃদ্ধি করেই এই অর্থ তোলা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় মিড ডে মিল চালু করে গ্রামীণ ছাত্রদের শিক্ষার আঙিনায় ফিরিয়ে আনার প্রচার চলছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের খাবারে পোকা। ছাত্রদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। এই খাবার নিয়েও চলছে দুর্নীতি। ড্রপ-আউটের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। গ্রামে-শহরে কয়েক প্রকারের স্কুল (কেন্দ্রীয় স্কুল, রাজ্য সরকারি স্কুল, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, বেসরকারি স্কুল ইত্যাদি) চলছে সমান্তরালভাবে। ফলে শিক্ষার মান বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলে ৮০ জন ছাত্র পিছু ১ জন শিক্ষক। ১৫৯ ছাত্রের জন্যও থাকবে একজন শিক্ষক। ১৬০ হলেই তবেই একমাত্র দু'জন হবে। স্কুল শিক্ষার অবনমনের কারণে ছাত্রদের প্রাইভেট টিউশনের দিকে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। মোটা অর্থ ঢেলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবকরা। কোনও কোনও অভিভাবক সরকারি স্কুলে পড়াশোনার অবস্থা দেখে প্রাইভেট স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন। সেখানেও গাদা গাদা ফি। হুগলির একটি বেসরকারি স্কুল টেকনো ইণ্ডিয়ায় ক্লাস ওয়ানের শিশুর ভর্তির জন্য লাগছে ২৩ হাজার টাকা। এত বিপুল টাকা দিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে পড়ানো কি সম্ভব।

স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করেছে রাজ্য সরকার। ১৭ টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার সবার আগে জীবনশৈলী শিক্ষার মোড়কে যৌনশিক্ষা চালু করেছে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে। যা শিশুদের কোমল মনকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাবে। পিটিটিআই ছাত্রদের ন্যায্য চাকরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। সিপিএমের এই নীতির জন্য ১৩ জন পিটিটিআই ছাত্র আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষায় সিপিএমের উন্নয়নের রূপ কত দুর্বার তা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে পিটিটিআই ছাত্রদের মৃত্যুর মিছিল দেখে।

শিক্ষায় রাজ্য সরকারের উন্নয়ন নীতি অগ্রগতি ঘটিয়েছে কতটা? কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের ৫৮টি ব্লক অশিক্ষার অন্ধকারে। এই রিপোর্টে আসেনি এমন ব্লকও আছে প্রচুর। ১০টি জেলার এই ৫৮টি ব্লকের মধ্যে রয়েছে দার্জিলিংয়ের-২টি, জলপাইগুড়ির-৬টি, কোচবিহারের-২টি, উত্তর দিনাজপুরের-৬টি, মালদার- ৩টি, বীরভূমের-২টি, পশ্চিম মেদিনীপুরের-২টি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার-৪টি, বাঁকুড়ার-১১টি, পুরুলিয়া-২০টি (আনন্দবাজার পত্রিকা-১৮.৫.০৭)। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় রাজ্য ৩২তম স্থানে। চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। সরকারের শিক্ষানীতির পরিণামে পিছন দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করতে আর বেশি দেরি নেই রাজ্যের। ২০০৭ সালেই ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী স্কুলছুটের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ পিছনে ফেলে দিয়েছে অন্যান্য বহু পিছিয়ে পড়া রাজ্যকেও (স্কুলছুটের সংখ্যা- ৯ লক্ষ ৬১ হাজার)। শিক্ষায় উন্নয়নের গর্ব করতেই পারে রাজ্য সরকার! ২০০৬ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলছুটের হার ৮০.২৪ শতাংশ, যা ভারতে সর্বাধিক।

পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। ছাত্রদের শিক্ষামুখী করার নামে বছরে একটি বা দুটি পরীক্ষার পরিবর্তে সারা বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন বা তথাকথিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন চালু করেছে, যা ছাত্রদের শিক্ষার সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ, পড়ার আতঙ্ক তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আর এত বেশি সংখ্যক পরীক্ষা হওয়ায় পরীক্ষার গুরুত্ব যাচ্ছে কমে। মূল্যায়ন পদ্ধতির বিচিত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে অযোগ্য ছাত্রকে পাশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সার্বিকভাবে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটছে।

সর্বোপরি সিপিএম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে দলীয় ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে। কর্মচারীদের পরিণত করা হচ্ছে দলদাসে। শাসক দলের খাতায় নাম থাকলে তার সাত খুন মাপ। শিক্ষকরা কীভাবে পড়াবেন, কীভাবে ছাত্রদের শাসন করবেন, তারও নির্দেশ আসে ইউনিয়ন রুম থেকে। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামিয়ে আনা হয়েছে নৈরাজ্য। শিক্ষার কোনও পরিবেশ নেই।

সিপিএম সরকার শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দিতে পুঁজিপতিদের আহ্বান জানাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বণিকসভাকে আহ্বান জানান কিছু কলেজের ভার নেওয়ার জন্য। মন্ত্রীর যুক্তি ছিল শিল্পজগত যদি শিক্ষার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে শিল্প ও শিক্ষা দুই-ই উপকৃত হবে। এ সব নেহাতই কুযুক্তি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বণিকসভা যে শিল্পপতিদের মুনাফার দিকে তাকিয়েই কলেজ চালাবে, ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে নয়, একথা আজ শিশুরাও জানে। আসলে এভাবেই কলেজগুলিকে তুলে দেওয়া হল শিল্পপতিদের হাতে মুনাফার লোটার ক্ষেত্র হিসাবে, সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে।

শিক্ষাকে এ রাজ্যের সিপিএম সরকার শুধু পণ্য হিসাবে দেখছে তাই নয়, শিক্ষা যে মূল্যবোধ গড়ে তোলে, নীতি-নৈতিকতার জন্ম দেয় তাও ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর ছাত্রদের এই সর্বনাশা নীতির পক্ষে আনার উদ্দেশে বিবেক-মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে পাঠ্য বই থেকে মনীষীদের জীবনী বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে আনা হচ্ছে বর্তমানের বাজার-ভিত্তিক শিক্ষা। বইপত্রের ব্যাপক দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। কলেজগুলিকে করা হচ্ছে 'সেল্ফ ফিনান্সিং'। এই গালভরা নামের আড়ালে কর্তৃপক্ষকে বলা হচ্ছে, যেভাবে পার টাকা তোল। সরকারের শিক্ষা নীতির পরিণামে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্যই শিক্ষা বরাদ্দ হচ্ছে।

নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটাচ্ছে সিপিএম। বিরোধীদের পরিসংখ্যানকে ভুল প্রমাণিত করতে, শিক্ষায় স্কুলছুটের হার কম করে দেখাতে প্রতিবছর জোর গলায় সরকার বলছে, মাধ্যমিকে কত বেশি বেশি সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে। বাস্তবটা কী? যে কেউ বোঝেন, বিপুল জনসংখ্যার দৌলতে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। ফলে ড্রপ-আউট বাড়লেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এই ছাত্রবৃদ্ধি সরকারের ক্রেডিট নয়।

শিক্ষার এই চরম দৈন্যদশা সত্ত্বেও যদি সিপিএম সরকার বলে, তারা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তাহলে একটা কথাই তাদের জন্য উপযুক্ত —একটু আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় হাসব।

হিমঘরে আলু রাখছে বহুজাতিক কোম্পানি চাষির ঠাঁই নেই

হুগলি জেলায় আলু রাখার হিমঘরগুলিতে এলাকার চাষিদের 'ঠাঁই নেই'। হিমঘরের বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে বহুজাতিক কোম্পানি ও পাইকারি ব্যবসাদারদের আলু। আলুচাষিরা বলছেন, সরকারের জেলা কৃষি দফতর, জেলা কৃষি আধিকারিক ও প্রশাসন চুপটি করে বসে আছে। বরং বলা ভাল, বহুজাতিক কোম্পানি ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের প্রতি রয়েছে তাদের অপার অনুগ্রহ। সিপিএম সরকার ও তার প্রশাসনের 'শিল্পপতি-বান্ধব', 'কোম্পানি-বান্ধব' তকমা ছাড়ায় কে!

১৬ মার্চ হুগলির গৌরাঙ্গ কোল্ড স্টোরেজের সামনে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আলুচাষিরা। হিমঘরটিতে সাড়ে চার লক্ষ প্যাকেট আলু রাখার ক্ষমতা। তাতে দু-লক্ষ প্যাকেট আলু ঢুকিয়ে দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানি 'পেপসি', বৃহৎ ব্যবসাদারেরা ঢুকিয়ে দিয়েছে এক লক্ষ প্যাকেট আলু এবং ৫০ হাজার প্যাকেট আদা, লঙ্কা ও গাজর। এখন চাষিদের জন্য পড়ে আছে মাত্র এক লক্ষ প্যাকেট আলু রাখার জায়গা। অথচ, মাঠে পড়ে চাষিদের দু'লক্ষ প্যাকেট আলু। কোথায় রাখবে তারা? হিমঘরে রাখতে না পারলে সব পচে নষ্ট হবে! ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে আবারও আত্মঘাতী হবে আলুচাষিরা। কিন্তু, এ বিষয়ে সিপিএম সরকারের কোনও মাথা-ব্যথা নেই।

৩৫ বছরে সিপিএম বীজ পরীক্ষার পরিকাঠামোই দাঁড় করাতে পারেনি

রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর বীজ দিয়েছিল। বীজ থেকে গাছ হল; কিন্তু ফুল হল না। হুগলি, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুরে ক্ষোভে ফুঁসছে কৃষকেরা। বিঘের পর বিঘে জমিতে সূর্যমুখীর গাছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। পরের বছর কৃষি দফতর দিল অন্য ধরনের বীজ। তাতে ফল হল আরও খারাপ। বহু বীজ থেকে গাছই হল না। অনেক জায়গায় গাছ বেরোলেও ফুলের দেখা মিলল না। ক্ষোভের আগুন আরও বেড়ে গেল। এর পরে বাইরে থেকে আনা অন্য প্রজাতির বীজ তুলে দেওয়া হল চাষিদের হাতে। কিন্তু তা কখন পুঁততে হবে, কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে, সে সব শেখানোই হল না কৃষকদের। ফলে সমস্যা বেড়েই চলল। বার বার কেন এই বিভ্রাট? রাজ্যের কৃষি-বিজ্ঞানীদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে বীজ পরীক্ষার কাজটাই ঠিকঠাক হয় না। ফলে চাষিরা নিম্নমানের বীজ ব্যবহার করতে বাধ্য হন। ৩৫ বছরে সিপিএম বীজ পরীক্ষার পরিকাঠামোই দাঁড় করাতে পারেনি। আর কত সময় চায়?

দূষণসীমা লঙ্ঘনে পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলোই সারা দেশে তালিকার শীর্ষে

মেঘ নয়। ওটা দূষণের কালি। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার করাল দূষণ। যা দিনে দিনে ক্ষইয়ে দিচ্ছে দেশের তথা রাজ্যের একটা বিশাল এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেই সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য। বিপন্ন করে তুলছে জীবিকা। ... দূষণসীমা লঙ্ঘনে পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলোই তালিকার শীর্ষে। এ রাজ্যে ৫২ শতাংশ কারখানাই দূষণসীমা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত। ৯২ শতাংশ কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা প্রবল দূষণ ছড়িয়ে যাচ্ছে। খরচ বাঁচাতে তারা যন্ত্রটি আদপে ব্যবহারই করছে না বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কী? নোটিশ পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে রাজ্য প্রশাসনের! দূষণ-বিধি অমান্য করায় গত চার বছরে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুরের পঞ্চাশটি কারখানা বন্ধ করতে আড়াইশো নোটিশ পাঠিয়েছে। একটাও বন্ধ হয়নি। উল্টে অবাধ বিষ ধোঁয়া ছড়িয়ে চার জেলার শতাধিক গ্রামকে তারা বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। ধোঁয়ার কালি ও কাঁচা কয়লার গুঁড়ো চরাচর ঢেকে দিচ্ছে। সেখানে ঘাসের রং কালো, গাছের পাতা কালো, বিচালি কালো, এমনকী খেতে ফলানো ধানের ভিতরে চালের রংও কালো। সেই চালের ভাত খেয়ে নানা রোগে ভুগছে মানুষ। আর কালিমাখা ঘাস-বিচালি খেয়ে গরু-মোষ-ছাগল শুধু মরেই যাচ্ছে না, শাবকেরাও হচ্ছে পঙ্গু। অথচ এই প্রশাসনই হয় কথায় নয় কথায় সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালাচ্ছে, লাঠিপেটা করাচ্ছে, মিথ্যা অভিযোগে জেলে ভরছে। যৌথবাহিনী নামিয়ে জঙ্গলমহলে নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। তাহলে আইন লঙ্ঘনকারী এই সমস্ত স্পঞ্জ আয়রন মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? গোপন বোঝাপড়ার জন্যই কি? *(আ. বা., ০৯-০২-১১)*

হাওড়ার বন্ধ কারখানার জমিতে প্রমোটারের থাবা

'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। এই স্লোগানধারী সিপিএম হাওড়া শিল্পাঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি কারখানাও খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি...। এখানে একের পর এক বন্ধ কারখানার জমিতে চলছে প্রমোটারদের বহুতল নির্মাণের কাজ। বন্ধ কারখানার জমিতে প্রমোটারি বন্ধ করার ব্যাপারে সিপিএম নেতাদের কোনও আন্দোলন নেই। এলাকার মানুষের অভিযোগ, আসলে প্রমোটারদের মাথার উপর হাত রয়েছে এলাকার সিপিএমের কর্তাব্যক্তিদের।... এখানে এক সময় বহু কলকারখানা ছিল। সিপিএমের আমলে অধিকাংশতেই তালা ঝুলেছে।

সেন্ট্রাল কটন মিলের জমিতে এগারো তলা বাড়ি হয়েছে। একইভাবে ভিক্টোরিয়া কটন মিল, শ্যাম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, পাইওনিয়ার আয়রন ওয়ার্কস, অশোক স্টিল, ইন্ডিয়ান রবার কারখানা, অম্বিকা জুট মিল প্রভৃতি কারখানার জমিতে প্রমোটারি চলছে। অন্যদিকে, হাওড়া শহরে পাটের দড়ি তৈরির কারখানা গ্যাঞ্জেস রোপ প্রমোটারদের হাত ধরে নাম বদলে হয়েছে গ্যাঞ্জেস গার্ডেন। গ্যাঞ্জেস জুট মিলে এক সময় প্রচুর শ্রমিক কাজ করতেন। সিপিএমের জমানায় এই কারখানায় তালা পড়েছে। আর বন্ধ এই কারখানার জমিতে থাবা বসিয়েছে প্রমোটার। সেখানে গড়ে উঠেছে বিলাসবহুল আবাসন।... হাওড়া আয়রন কারখানা, ফোরশোর রোডে বিরানি মেটাল কারখানার জমিতে এখন বহুতল গড়ে উঠেছে। আর এই সব কারখানার শ্রমিকরা ঠাঁই পেয়েছেন নানা বস্তিতে। তাঁদের কাউকে কাটাতে হয়েছে অর্ধাহারে, কেউ বা সংসার টানতে যোগ দিয়েছেন অন্য কোনও ছোটখাট পেশায়। *(বর্তমান, ১৬-০৩-২০১১)*

রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৭টি আসনে প্রার্থী দিল এস ইউ সি আই (সি)

পাঁচের পাতার পর

তাঁরা যা করলেন, তাতে এটা পরিষ্কার, এতদিন জোট যে সরু সুতোয় ঝুলছিল, সেটা তাঁরাই ছিন্ন করে দিলেন। জোট আছে কি নেই, সেটা জনগণই বুঝে নেবেন। জোটের যা কিছু পরিণতি ঘটল, তার দায়িত্ব তৃণমূলের, আমাদের নয়। এই হচ্ছে বাস্তব।

এই অবস্থায় আমরা বলছি, আমাদের পূর্বঘোষিত যে সিদ্ধান্ত — সিপিএম সরকারের অপসারণ চাই, যা আমরা বলে এসেছি, সেটা বজায় থাকবে। কারণ সিপিএম সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে, অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা তারা করত, তাও জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-জনগণের আন্দোলনকে নৃশংসভাবে দমন করে এসেছে, বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে। অবশ্য মার্কসবাদী তারা কোনও দিনই ছিল না। কংগ্রেস-বিজেপি বুর্জোয়া দল, তারা ভোটে মাসল পাওয়ার বা গুণ্ডাবাহিনী ব্যবহার করে, দাঙ্গার সময় মাসল পাওয়ারকে ব্যবহার করে। কিন্তু গণআন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে তারা সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারি ছাড়া অন্য কিছু প্রয়োগ করেছে, ভারতে এমন ঘটনা ঘটেনি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল, সিপিএম ট্রেনিং দিয়ে সংগঠিত সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী গড়ে তুলেছে পশ্চিমবাংলার বুকে গণআন্দোলন দমন, বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ, সন্ত্রাস, হত্যা, খুন এবং ভোটে রিগিং করার উদ্দেশ্যে। এই আক্রমণ আমাদের দলের উপর বার বার ঘটেছে। আমাদের ১৫৮ জন নেতা-কর্মীকে তারা খুন করেছে, সাজানো মামলায় ৪৯ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, ১১০০ জনের উপর অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের মিথ্যা চার্জ দিয়ে মামলা করেছে। গণধর্ষণ, গণহত্যা ইত্যাদি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে যা করেছে, তার তুলনা ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে না।

সিপিএম নেতারা বলেছেন, তাঁরা পার্টির শুদ্ধিকরণ করবেন। শুদ্ধিকরণ কী করেছেন, লালগড়ের নেতাইয়ে গণহত্যার দ্বারা আবার তাঁরা তা প্রমাণ করে দিলেন। আর এই সিপিএম গোটা রাজ্যে মানুষ যাতে মুখ খুলতে না পারে, এমনকী পাড়ায়-বাড়িতে-ট্রেনে-বাসে যাতে বিরুদ্ধে কথা না বলতে পারে, এমন শ্বাসরোধী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কন্ট্রাক্টরি, প্রোমোটারি, দুর্নীতি, তোলাবাজির রাজত্ব কায়েম করেছে। পুলিশ-আমলা, কালোবাজারি-ব্যবসাদার-ক্রিমিনাল ও সরকারি দলের একটা দুষ্টচক্র গড়ে তুলেছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করেছে। স্কুলের দারোয়ান থেকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ পর্যন্ত আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ঠিক করছে। ছাত্রদের ফি, হাসপাতালের চার্জ বাড়িয়েছে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় প্রাইভেটাইজেশন এনে দিয়েছে। বহু নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়েছে, যৌনশিক্ষা চালু করেছে, জুয়া-সাট্টা-মদের অঢেল কারবার এনেছে। নারীহত্যা, নারীধর্ষণ, নারীপাচারের কেন্দ্র হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। এইসব কারণে এবং যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি তারা করেছে, তার জন্য আমরা বলেছি, সিপিএম মাস্ট গো। এ কথা আমরা আগেই ঘোষণা করেছি। ফলে সিপিএমের আমরা অপসারণ চাই এবং সিপিএমের অপসারণের অর্থে, একমাত্র এই কারণেই, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করব। তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষ আছেন, তার একদল আশা করেন, তৃণমূল কংগ্রেস অনেক কিছু করবে। আর এক দল মনে করেন এবং তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, তৃণমূল কংগ্রেসও নতুন বিশেষ কিছু করবে না। এমনকী তাঁরা তৃণমূলের সাম্প্রতিক কথাবার্তায়, কাজকর্মে, পঞ্চায়েত-মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় এবং তৃণমূলেও সমাজবিরোধীদের ভিড় হওয়ায় হতাশাগ্রস্ত, তবুও সিপিএম-কে হারাবার জন্য তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন। আর আমরা চাই, সিপিএম যাক, যদি তৃণমূল কংগ্রেস পাওয়ারে এলে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের, গণআন্দোলনের কিছু সুযোগ পাওয়া যায়, যদি গণআন্দোলন দমনে পুলিশের নৃশংস আক্রমণ কিছুটা সংযত করা যায়। এই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা এর আগেও বলেছি, তৃণমূল কংগ্রেস এলে সোনার বাংলা করবে, অমুক করবে, তমুক করবে — আমরা তা বিশ্বাস করি না। আমরা বলেছি, তৃণমূল কংগ্রেস একটা আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পার্টির রাজনৈতিক কাঠামোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। যে কোনও সরকার, এমনকী আমরাও যদি সরকার করার সুযোগ পাই, হয় পুঁজিপতি শ্রেণী, অত্যাচারী শক্তি, না হলে শ্রমিক শ্রেণী ও অত্যাচারিত জনগণ — দুই শ্রেণীর কোনও এক পক্ষে আমাদের কাজ করতে হবে। এর বাইরে যাওয়ার কারও কোনও উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে শুধু পুঁজিপতিদের স্বার্থে সরকারি দলগুলি চলে তাই নয়, আজ পুঁজিপতি শ্রেণীই এই সব দলের প্রার্থী, এমনকী মন্ত্রী কারা হবে, তা ঠিক করে। কারণ পুঁজিপতিদের মানি পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার ও মাসল পাওয়ারই ভোট ঠিক করে। তাই ভোটে সরকার পাল্টে জনগণের মৌলিক কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। যদি সততার সাথে তাঁরা সরকার চালাতে চান, 'যদি' কথাটা এখানে অবশ্য বড় প্রশ্ন হয়ে থাকছে, তাহলে তাঁরা হয়ত কিছু দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন, রেশনিং-এ, পঞ্চায়েতে যে সব চুরি হয়, সে সব বন্ধ করতে পারেন, পুলিশে যে ঘুষের রাজত্ব চলছে, অত্যাচারের রাজত্ব চলছে, সে সব বন্ধ করতে পারেন, মানুষকে কিছু রিলিফ দিতে পারেন, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতাও হয়ত কিছু পালন করতে পারেন, এর বেশি কিছু করার উপায় নেই। অবশ্য আবারও বলছি, যদি তাঁরা চান, তবেই এটুকুও সম্ভব। চরম দুর্দশাগ্রস্ত জনজীবনের যথার্থ পরিবর্তন একমাত্র হতে পারে বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে। একমাত্র পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবের দ্বারাই সেটা সম্ভব। এটা সম্ভব করতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে। এই বক্তব্য এবং শিক্ষা নিয়েই আমাদের দলের সমস্ত কাজকর্ম আমরা করে যাই।

এ কথাও আমি বলব, সাধারণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থন করলেও কিছু প্রার্থী সম্পর্কে আমাদের আপত্তি আছে। অর্থাৎ যাঁরা স্পেশাল ইকনমিক জোনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন, কংগ্রেস আমল থেকে সিপিএমের রাজত্ব পর্যন্ত যে সব আমলা, যে সব পুলিশের কর্তারা গণআন্দোলন দমন করেছেন, সেইসব প্রার্থীদের হয়ে আমাদের কর্মীরা প্রচার করতে পারবে না। সাধারণ ভাবে আমরা তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনের কথা বললেও, জনগণ যে সব প্রার্থীকে চান না, যাদের রেকর্ড পাবলিকের মধ্যে খারাপ, তাদের পক্ষে আমাদের কর্মীরা প্রচারে নামবে না।

কংগ্রেস সম্পর্কে আমরা আগেও বলেছি, কংগ্রেসের ইতিহাস কলঙ্কজনক। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসই এ দেশের বিপ্লববাদকে আঘাত করেছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। এই জাতীয় কংগ্রেসই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেছিল। এগুলি আমরা ভুলতে পারি না। আমরা ভুলতে পারি না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে সাত-তাড়াতাড়ি গদিতে বসতে হবে বলে এক অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভক্তি নেহরু-প্যাটেলরা মেনে নিলেন, এমনকী যা গান্ধীজীও চাননি। অতি দুঃখে শেষ জীবনে তিনি বলেছিলেন, সুভাষ বোস থাকলে এটা হত না। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতায় আসার পর থেকে কংগ্রেসের শাসন নিরবচ্ছিন্ন শোষণ-লুণ্ঠনেরই শাসন। ভারতবর্ষের জনজীবনের আজ যত সংকট — দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারত্ব, নারীর ইজ্জতহানি, মনুষ্যত্বের সংকট, মূল্যবোধের সংকট, ব্যাপক দুর্নীতি, গণআন্দোলনে নিপীড়ন থেকে যা কিছু জনবিরোধী, কংগ্রেস তা করে এসেছে এবং করে যাচ্ছে। এবং বিজেপিও ব্যতিক্রম নয়। বিজেপি প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িকতায় ভূমিকা নেয়, কংগ্রেস প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতায় ভূমিকা নেয়। উভয় দলই সেটা ভোটের স্বার্থে করে। কংগ্রেস আজ দুর্নীতির সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রতিদিন কাগজ খুললে একটার পর একটা আর্থিক কেলেঙ্কারি পাওয়া যায় কংগ্রেস নেতাদের। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে আজ হয়ত পাগল হয়ে যেতেন। এদেশের স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা, এমনকী গান্ধীবাদীরাও এই পরিণতি চাননি। গোটা কংগ্রেসে চলছে পরিবারতন্ত্র। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আজ দেখছি সব দলেই প্রায় পরিবারতন্ত্র চলছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এসব ছিল না। দুর্নীতিতে, পাবলিকের টাকা আত্মসাতে বিজেপি, সিপিএম কোনও সরকারি দলই বাদ নেই। এই সব ভোটসর্বস্ব দলগুলি সাধারণ চোর-ডাকাতদেরও হার মানাচ্ছে। বুর্জোয়া রাজনীতির আজ এই করুণ দশা! 'কেন্দ্রে কংগ্রেস থাকবে, রাজ্যে সিপিএম থাকবে', দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেস এই বোঝাপড়া করে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন

সেজন্যই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা প্রার্থী দেব। কংগ্রেসের সব কেন্দ্রে আমরা প্রার্থী দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তীব্র আর্থিক সংকটে ভুগছি। আমাদের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী থেকে শুরু করে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচজন নেতার কঠিন রোগের চিকিৎসা করাতে হয়েছে, সেজন্য আমরা আর্থিক দিক থেকে অনেকখানি সংকটগ্রস্ত। ফলে আমরা ১৭টা আসনে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ব। তাছাড়া জয়নগর, কুলতলিতে তো লড়ছিই।

সাথে সাথে আমরা এ কথা বলতে চাই যে, আমরা চাইলে আরও ৪৬টি আসনে লড়তে পারতাম, যেখানে আমরা মার্জিনাল ফোর্স, অর্থাৎ তীব্র পোলারাইজেশনের মধ্যেও ৫, ৮, ১০ হাজার ভোট পেয়েছি গতবার। যদি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে এই সব কেন্দ্রে আমরা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। কিন্তু আমরা সেখানে লড়ছি না। কারণ আমরা লড়লে সিপিএমের সুবিধা হয়ে যেতে পারে। এখানে একটা বিশেষ আসনের কথা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে পূর্ব বারুইপুর। গত লোকসভা ভোটে বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৭ হাজার ভোটে লিড হয়েছিল। এর মধ্যে ১১ হাজার লিড হয়েছিল আমাদের দল প্রভাবিত এলাকায়, জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে ৬টা অঞ্চল বেরিয়ে এসেছে, সেই এলাকায়। এই অঞ্চলগুলোতে পঞ্চায়েত আমরা পরিচালনা করি। বাকি তৃণমূল প্রভাবিত এলাকা থেকে মাত্র ৬ হাজার ভোট এসেছিল। সেই কেন্দ্রও তৃণমূল কংগ্রেস এবার আমাদের ছাড়েনি। তারা যা করেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু আমরা সিপিএমের পরাজয় চাই। সেই জন্য আমরা এইসব মেনে নিয়েছি। অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন, আপনারা আরও সিটে প্রার্থী দিয়ে দিন। আমরা সেই পথে যাইনি। আমরা পরিচ্ছন্ন রাজনীতির মধ্যে থাকি।

আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই— সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যে ভূমিকা তাঁরা নিয়েছিলেন তার জন্য। আমরা তখন তাঁদের প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছি, একান্তেও করেছি। যদিও অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁদের নেতারা পাল্টে গেছেন। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তাঁরা যেভাবে আমাদের সমর্থন করেছিলেন, তার জন্যও আগেই ধন্যবাদ জানিয়েছি, না হলে আমরা জিততে পারতাম না। ওঁদের কেন্দ্রগুলিতেও আমাদের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, সেটা ওঁরাও স্বীকার করেছেন। কোনও দল বা নেতা সম্পর্কে আমাদের বিদ্বেষ নেই। ২০০১ সালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের এক বৈঠকে সিপিএম আমাদের অফার দিয়েছিল বামফ্রন্টে যোগ দেওয়ার জন্য। তা করলে আমরা নিশ্চয় কিছু সিট পেতাম। কিন্তু আমরা যাইনি। জ্যোতিবাবুর মৃত্যুর পরে স্মরণসভায় তাঁদের এক নেতা ঐ ডায়াসে বসে আমাকে বলেছিলেন, 'আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নয়, আপনাদের অফিস নয়, অন্য কোথাও আসুন, একদিন বসুন'। আমি উৎসাহ দেখাইনি। ওদের সাথে গেলে কিছু সিট নিশ্চয় পেতাম। এসব এম এল এ-এম পি পাওয়ার রাজনীতির মধ্যে আমরা নেই। বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে আমরা চলি, চলব। সব দলের নেতা-কর্মীদের সাথেই আমরা সুসম্পর্ক রাখি, কারোর প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। সৌহার্দ্য রেখেই আমরা চলার চেষ্টা করি। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সাথেও আমাদের সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য থাকবে।

আমি পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে বলব, হাজার হাজার মানুষ যে ভাবে তৃণমূলের সিদ্ধান্তে

আটের পাতায় দেখুন

প্রার্থী তালিকা

	কেন্দ্র	জেলা	প্রার্থী
১।	মেখলিগঞ্জ (এস সি)	কোচবিহার	কমরেড প্রমীলা রায়
২।	সিতাই (এস সি)	কোচবিহার	কমরেড অনিলচন্দ্র বর্মন রায়
৩।	আলিপুরদুয়ার	জলপাইগুড়ি	কমরেড অভিজিৎ রায়
৪।	ফাঁসিদেওয়া (এস টি)	দার্জিলিং	কমরেড ভোলা তির্কি
৫।	করণদিঘী	উত্তর দিনাজপুর	কমরেড মুখতার আহমেদ
৬।	গাজোল (এস সি)	মালদহ	কমরেড গৌতম সরকার
৭।	সূতি	মুর্শিদাবাদ	কমরেড সামিরুদ্দিন
৮।	জঙ্গীপুর	ঐ	কমরেড মির্জা নাসিরুদ্দিন
৯।	রাণীনগর	ঐ	কমরেড আবুল আক্তার সরকার
১০।	ডোমকল	ঐ	কমরেড বাইজিদ হোসেন
১১।	কুলতলী (এস সি)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার
১২।	জয়নগর (এস সি)	ঐ	কমরেড তরুণ নস্কর
১৩।	সবং	পশ্চিম মেদিনীপুর	কমরেড নারায়ন অধিকারী
১৪।	বাঘমুন্ডি	পুরুলিয়া	কমরেড বিশম্বর মুড়া
১৫।	পারা (এস সি)	ঐ	কমরেড শিবানী বাউড়ি
১৬।	তালডাংড়া	বাঁকুড়া	কমরেড কবিতা সিংহবাবু
১৭।	কাটোয়া	বর্ধমান	কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী
১৮।	হাসন	বীরভূম	কমরেড অমল মন্ডল
১৯।	নলহাটি	ঐ	কমরেড রফিকুল হাসান

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

পশ্চিমবঙ্গে বছরে লক্ষাধিক শিশু অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা যায়

খাদ্য না উন্নয়ন, জীবনে কোনটি আগে প্রয়োজন? এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর সকলেরই জানা। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকারের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে যেন জীবনে খাদ্য না হলেও চলে, কেবল উন্নয়ন চাই। তারা উন্নয়নের ঢ্যাঁড়া পেটাচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ভাবখানাও অনুরূপ। তারাও 'গ্রোথ' 'গ্রোথ' করছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলছেন, গ্রোথ বাড়ছে। আসলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর ঘটছে সম্পদের গ্রোথ, আর জনজীবনে হচ্ছে সংকটের গ্রোথ। পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি যে সাধারণ মানুষের নিঃস্বকরণের মধ্য দিয়ে, এটাই শাসকশ্রেণী কৌশলে চাপা দিতে চায়। তাই ওরা 'সকলের উন্নয়ন, সকলের গ্রোথ' — এইসব শুনতে ভাল লাগা কিছু নিষ্ফলা তত্ত্ব নিয়ে আসে। এতে অবশ্য একটা উদ্দেশ্য তাদের হাসিল হয়। তা হল, ওরা যে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে সেটা সাময়িকভাবে হলেও আড়াল করা যায়।

নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। সিপিএম বরাবরের মতো এবারও উন্নয়নের স্লোগান তুলেছে। ৩৫ বছরে তারা কত উন্নয়ন করেছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছে। এদিকে তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ জেরবার। মানুষ যদি খেয়ে পরে নাই বাঁচল — তবে এ উন্নয়ন কার উন্নয়ন? আগে তো মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস ও রাজ্যের সিপিএমের ভূমিকা চূড়ান্ত অপদার্থতার। গত দু'বছর ধরে মূল্যবৃদ্ধি যে এতদিনকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল, তা নিয়ন্ত্রণে কী করেছে এই দুই সরকার? কিছু নিষ্ফলা বাণী দেওয়া ছাড়া কোনও ভূমিকাই তারা পালন করেনি। এই নিষ্কর্মাদের কি ভোট দেওয়া চলে?

গুলি করে মানুষ মারা অপরাধ। কিন্তু অনাহার, অর্ধাহারের মধ্যে *ঠেলে* দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করা কি অপরাধ নয়? অনাহার অর্ধাহারের কথা তুললেই কিছু লোক বলে, 'কোথায় অনাহার? সন্ধেবেলায় শহরের ফাস্টফুড দোকানগুলিতে যে ভিড় দেখা যায়, তাতে কি মনে হয় লোকের হাতে পয়সা নেই, তারা না খেয়ে থাকে'? এ কথাগুলি যাঁরা বলেন, তাঁরা অবশ্য সমাজের উঁচুতলার লোক, যাঁদের দৃষ্টি শহরের ঘিঞ্জি বস্তিতে বা পল্লির অন্তঃপুরে পৌঁছায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তর ২০০৬ সালে যে 'গ্রামীণ গৃহস্থালি সমীক্ষা' করেছে তাতে বলা হয়েছে, গ্রামীণ জনসংখ্যার ২০ শতাংশ অর্থাৎ বছরে প্রায় এক কোটি গ্রামীণ মানুষ প্রতিদিন দু'বেলা খেতে পান না।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৫তম পর্ব (১৯৯৯-২০০০) অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭ শতাংশ গ্রামবাসী দৈনিক মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য না পেয়ে স্থানী অপুষ্টিতে ভুগছেন এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন। শহরাঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২১৫০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ৬৫ শতাংশ শহরবাসী স্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছেন ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এসব স্বীকার করে না। করলে তাদের সুশাসনের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের মধ্যে লৌহঘটিত রক্তাল্পতা অত্যধিক। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬ মাস থেকে ৩৫ মাস বয়সী শিশুদের ৭৮.৩ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে। গ্রামে এই হার ৮১.৫ শতাংশ, শহরে ৬৪.১ শতাংশ। এই হিসাব দশ বছরের পুরনো। বর্তমানে চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধিতে অবস্থা আরও দুর্বিষহ। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কমিউনিটি মেডিসিনের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৬ শতাংশ প্রতি বছর অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে। অর্থাৎ এ রাজ্যে প্রতি বছর এক লক্ষেরও বেশি শিশু অপুষ্টি ও অনাহারে মারা যাচ্ছে।

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি গর্ভের সন্তানকে পুষ্টি জোগায়। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নিচের মায়েরা প্রয়োজনীয় এই পুষ্টিগত খাদ্য পান না। মহিলাদের অপুষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৫২ শতাংশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা ১২ শতাংশ বেশি, অর্থাৎ ৬৪.৭৪ শতাংশ।

বামফ্রন্ট সরকার বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে 'সজলধারা' প্রকল্পের প্রচার চালালেও আজও রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পান না। পশ্চিমবাংলার ৯টি জেলা এবং কলকাতা কর্পোরেশনের ৮৭টি ওয়ার্ডের ভূগর্ভের জল আর্সেনিক কবলিত। এইসব এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যে একটা সরকারের প্রধান দায়িত্ব এবং তাতে সিপিএম সরকার যে ডাহা ফেল, সরকারি তথ্যই তা বলে দেয়।

কেন এই ক্ষুধা চিত্র? সিপিএম তার ৩৫ বছরের সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে ১৩ মার্চ গণশক্তিতে লিখেছে, চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম, সবজি উৎপাদনেও প্রথম, আলু উৎপাদনে দ্বিতীয়, মাছ উৎপাদনে প্রথম, আনারসে প্রথম, লিচুতে দ্বিতীয়, আমে অষ্টম। তাদের প্রচার শুনে মনে হবে যেন একেবারে লক্ষ্মীর ভরা সংসার এই পশ্চিমবাংলা। কিন্তু কোথায় যায় এই খাদ্য? কেন রাজ্যে মানুষ অনাহারে মরে? কেন বছরে এক লক্ষেরও বেশি শিশু অনাহার-অর্ধাহার-অপুষ্টিতে মরে? শিশুরাই না জাতির ভবিষ্যৎ! কার অপরাধে, কোন অপরাধে এতগুলি ভবিষ্যতের অকাল মৃত্যু ঘটে এই পশ্চিমবাংলায়? কেন ঘটে অন্যান্য রাজ্যে? নির্বাচনের প্রাক্কালে এসব প্রশ্নের উত্তর কি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নয়?

কেন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তা কমবেশি সকলেরই জানা। মজুতদার-মুনাফাখোর-কালোবাজারিরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। এটা সকলেই স্বীকার করেন। এটাও প্রায় সকলেই বোঝেন যে, ১৯৯১ সালে প্রণীত মনমোহন সিংহ সরকারের উদার অর্থনীতির ফলে বাজারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ায় বৃহৎ ব্যবসায়ীরা লাগামছাড়া দাম বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে গেছে। এটাও বহু আলোচিত যে, খাদ্যের ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের জায়গা করে দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার রেশন ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা মাফিক দুর্বল করে দিয়েছে। এটাও স্বীকৃত যে, তীব্র বাজারসংকটে জর্জরিত পুঁজিপতিশ্রেণীর অলস পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা করে দিতেই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে ঢোকানো হচ্ছে এবং তারা খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত পণ্য মজুত করছে, দাম বাড়াচ্ছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বায়নের নীতি মেনে সরকার পুঁজিপতিদের ভরতুকি দিচ্ছে, কিন্তু জনকল্যাণে ভরতুকি কমাচ্ছে। এর সামগ্রিক পরিণামেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় বাড়েনি।

অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এদেশের ৭৭ শতাংশ জনগণের দৈনিক ২০ টাকার বেশি খরচ করার উপায় নেই। চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে ২০ টাকায় একজন ব্যক্তির একবেলা আহারও ঠিক মতো জোটে না। তাছাড়া, জামা-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন তো আছেই। তাহলে অনাহার-অর্ধাহার অপুষ্টি আসবে না কেন? এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে ওষুধের দাম যে মাত্রাছাড়া বাড়িয়েছে তাতে এই ৭৭ শতাংশ জনগণ অসুস্থ হলে কী করবে? জলপড়া, তেলপড়া হবে তাদের সম্বল। এতো পরিকল্পিত ভাবে মানুষকে মৃত্যুর গহ্বরে *ঠেলে* দেওয়া। বাস্তবে কেন্দ্রে-রাজ্যে যেভাবে শাসন চলছে, তাতে দেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের অকাল শ্মশানবোধন বা কবরবোধন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভোটে সরকার পাল্টায়, পুঁজিপতি তোষণ নীতি পাল্টায় না। এ রাজ্যে সিপিএমের ফ্যাসিস্ট সুলভ অত্যাচার রুখতে সরকার পাল্টানোর লড়াই চলছে। একে তীব্রতর করতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নীতি পাল্টানোর লড়াই। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত নীতিমালার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। এই মূল কথাটা মনে রাখা জরুরি।

পরাধীন ভারতে কবি নজরুল বলেছিলেন, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ/চায় দুটো ভাত একটু নুন'। সেই নুনভাত আজও ক্ষুধার্ত শিশুর কপালে জুটল না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার পর ৬৩টি বসন্ত পার হয়ে গেছে, শিশুরাষ্ট্র রীতিমতো পরিণত, পারমাণবিক শক্তিধর। অথচ ''নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব/ ঠিক মানুষের মতো / কিংবা ঠিক নয় / .....জঙ্গলের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়/ উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে খোঁকে / আর ফ্যান চায়।'' এখনও আমলাসোলে মানুষ না খেয়ে মরে। এখনও জলঙ্গির জাহেদা বেওয়াকে খাদ্যের জন্য রাস্তায় বসে হাত জোড় করে ভিক্ষে করতে করতেই মরে যেতে হয়।

'মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান/ তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।'' লিখেছিলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। এবার কি ধ্যান ভাঙবে? না কি মানুষের চিন্তা কেবল সরকার পাল্টানোর চৌহদ্দিতেই হাবুডুবু খাবে?

রাজ্যের ৩ কোটি মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার

পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে ৯টি আর্সেনিক দূষণের শিকার। এর মধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, দুই ২৪ পরগণা — এই ৬টি জেলার অবস্থা খুবই খারাপ। হাওড়া, হুগলির একাংশ এবং কলকাতা পুরসভার ৮৭টি ওয়ার্ড আর্সেনিক কবলিত। পশ্চিমবঙ্গের ৩৫.৭ শতাংশ মানুষ আর্সেনিক বিপদের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। ৫ লক্ষের বেশি মানুষ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে অসুস্থ। ইতিমধ্যে ১২০০-র বেশি আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন বিষক্রিয়ায়। সরকারি মহল থেকে বলা হচ্ছে, প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিকযুক্ত জল পান করলে কোনও ক্ষতি হবে না। অথচ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (হু) অভিমত হল পানীয় *জলে* আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম। সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম। এসএসকেএম হাসপাতালের আর্সেনিক ক্লিনিকের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ডাঃ ডি এন গুহমজুমদার ও তার সহকর্মীগণ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামে সার্ভে করে দেখেছেন যে, প্রতি লিটারে ০.০১-০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক যুক্ত জলপানকারীদের মধ্যে ৯৭ জন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী। এই সমীক্ষা দেখাচ্ছে সরকার আর্সেনিক বিপদ চেপে রাখতে চাইছে। আসলে সরকারের দায়িত্ববোধই আজ আক্রান্ত। স্বাধীনতার ৬৩ বছরেও সর্বত্র নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাও করতে পারেনি।

হায়দ্রাবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ পালন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষে এ আই এম এস এস-এর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল একটি মিছিল হায়দ্রাবাদ শহর পরিক্রমা করে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শত শত মহিলা মিছিলে অংশ নেন, হাতে তাঁদের একশোটি লাল পতাকা — আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ পূর্তির প্রতীক। মিছিলের শেষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর। সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড জি ললিতা। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সি এইচ প্রমীলা। কর্মসূচিটির উদ্বোধন করেন হায়দ্রাবাদের হোম সায়েন্স কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ সারা কমলা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

সাতের পাতার পর

ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন, আমাদের প্রতি উদ্বেলিত আবেগ প্রকাশ করেছেন, আমরা তাতে অভিভূত। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের কাছে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। ১০-১৫টা সিটও যদি আমাদের বাড়ত, আমি মনে করি, তার চেয়েও আজকে জনগণের যে ভালবাসা, সমর্থন, সহানুভূতি পাচ্ছি, যে আবেগ দেখতে পাচ্ছি, সেটা অনেক বড় প্রাপ্তি। এই শক্তির জোরেই— বিধানসভায় যদি আমরা নিশ্চিহ্নও হয়ে যাই, লোকসভায় আমরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তাহলেও আমরা যেমন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের দাবি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছি, সেই লড়াই চালিয়ে যাব। আজ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চূড়ান্ত সংকটের দিনে ছাত্র-যুবশক্তির মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগাবার জন্য আমরা নবজাগরণের মনীষী এবং ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবীদের স্মরণ দিবসগুলি উদযাপন করার মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করে যাচ্ছি, সেটা অব্যাহত থাকবে। যেমন ২৩ মার্চ আমরা শহিদ-এ-আজম ভগৎ সিং স্মরণ দিবস উদযাপন করব গোটা ভারতবর্ষে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই, আজ প্রেস কনফারেন্সের দেড় ঘন্টা আগে তৃণমূল কংগ্রেস ফোন মারফৎ আমাদের মেসেজ পাঠায়, 'আপনাদের আমরা বিধান পরিষদে একটা সিট দেব'। আমি এখানেই বলে দিচ্ছি, নীতিগতভাবে আমরা বিধান পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে। কারণ এমনিতেই এম এল এ-এম পি-দের বেতন-ভাতা যেভাবে বাড়ছে, সেটা জনগণের টাকার বিপুল অপব্যয়। এই বিধান পরিষদ মানে আরও টাকার অপচয়। অতীতে এক সময় যখন এ রাজ্যে বিধান পরিষদ ছিল, তখনও বরাবর আমরা তার বিরুদ্ধতা করেছি। ফলে আমরা এর মধ্যে নেই, প্রকাশ্যেই তা বলে দিচ্ছি। এ কথা বলেই উপস্থিত সকল সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

বাবরি মসজিদ বিতর্ক
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়
বিচারের প্রহসন
প্রাপ্তিস্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।